অন্ধকারের হাত

ধনঞ্জয় রায়

B·P

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ পৌষ ১৩৬২

প্রকাশিকা ঃ
মঞ্জু দাশ
লেকটাউন,
কলিকাতা-৮৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ
বিন্দু পাল

মুদ্রাকর ঃ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২নং বিডন রো,
কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

সোনা রঙের দিন
অবগাহন
পুণ্যিবালা
বীজ যেমন হয়
ইছামতী থেকে আমাজন (সম্পা :)
ঘনশ্যাম চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প
ভিয়েতনামের মজার গল্প (সম্পা :)

গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

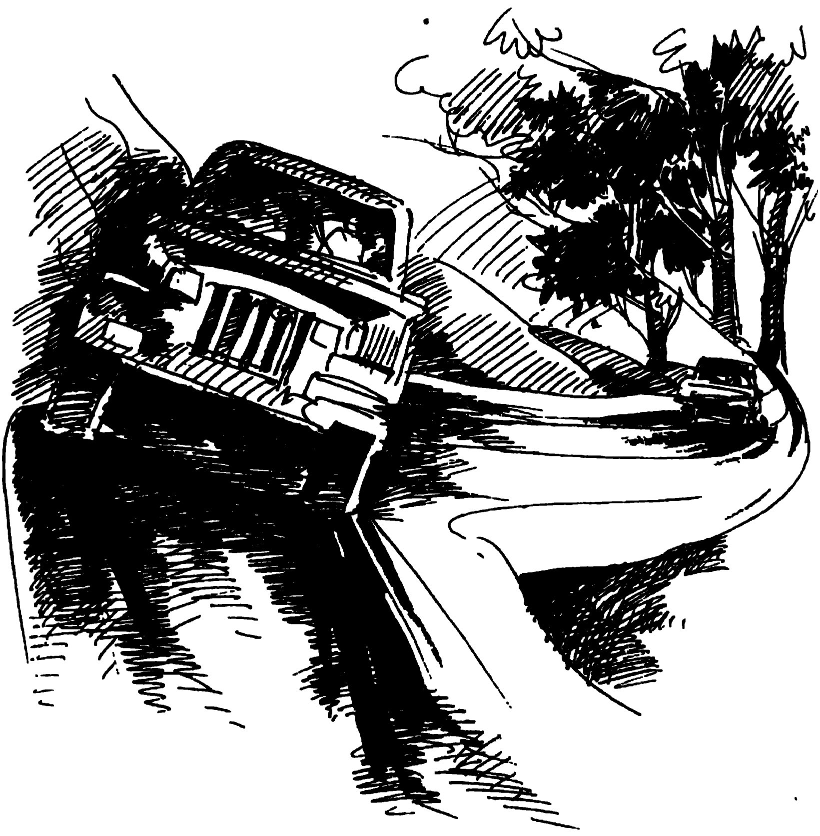
অপারেশন-এক্স
রহস্যের গোলকধাঁধা
ভয়ঙ্কর দ্বীপের রহস্য
রহস্যঘেরা অরণ্যভূমিতে
অরণ্যে বিষের ছোঁয়া
ছোবল
নেশা
রহস্যবনে
ভয়ঙ্কর রাম্পা

ভূমিকা

গোয়েন্দা কেদার মজুমদার এবং তাঁদের সংস্থা 'উদিতভানু ইনফরমেশন' এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষজনের কাছে যেন আশীর্বাদের মতো। কেদারের সহকারী বদ্রীনারায়ণ তার অবচেতন মন তোলপাড় করে রহস্যের বেড়াজাল ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে। তার চিন্তার স্তরে স্তরে চলে সত্য সন্ধানের পথে এগিয়ে চলার আন্তরিক চেষ্টা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্ল্যাক বেল্ট কেদারের কৌশলী সক্রিয়তা। দু'য়ে মিলে কেদার-বদ্রী এখন দারুণ সফল গোয়েন্দা জুটি। কেদার-বদ্রী অ্যাডভেঞ্চার সিরিজের পাঠকরা যদিও জানেন, তবু আরো একবার বলি ; কেদার-বদ্রী দু'জনেই বইয়ের পোকা। কেদারের পছন্দ পপুলার সায়েন্স থেকে শুরু করে ইতিহাস এবং গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, নির্মলেন্দু গুণ—এমন অনেক কবির কবিতা কেদারের সর্বক্ষণের সঙ্গী। কেদারের প্রভাবে বদ্রীও এখন কবিতার ভক্ত হয়ে উঠেছে। যৌবনের সন্ধিক্ষণে পা রাখা বদ্রীর কমনীয় মুখে ভিন্ন গ্রহের মানুষের আদল। বদ্রীনারায়ণ পড়তে ভালোবাসে ক্লাসিক উপন্যাস, বিদেশি ফিকশন আর বিজ্ঞানের কাহিনী। এই দু'জন আজ ছোট-বড় সব পাঠকেরই মন জয় করে নিয়েছে। সকলের ভালো লাগছে, তাই কেদার-বদ্রী জুটির রহস্যকাহিনী লিখতে আমিও উৎসাহ পাচ্ছি। সবসময় সাহায্য করছেন আমার স্ত্রী নমিতা চৌধুরী। সর্বোপরি দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশু দে-র আন্তরিক আগ্রহ এবং একান্ত সুহৃদ সমর পালের সহযোগিতা এই গোয়েন্দা সিরিজটি এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সূচী

সাইক্লোট্রাইমেথিলিন ট্রাইনাট্র্যামিন



রেললাইনের দু'পাশে এখানটায় ঘন জঙ্গল। লোকদুটো রেলপথের ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সতর্ক চোখে ওরা দু'দিকেই নজর রাখছিলো। সন্ধে হয়ে আসছে। এমনিতেই ঘন জঙ্গলের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকার। এবার ডানপাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে আরো একটা লোক বেরিয়ে এলো। দাঁড়িয়ে থাকা দু'জনকে ইশারায় কিছু জিজ্ঞেস করলো। ওরাও হাতের ভঙ্গীতে উত্তর দিয়ে জানালো, সব কিছু ঠিক আছে।

মনে হচ্ছে, বহুদূর থেকে কোনো ট্রেনের আওয়াজ ভেসে আসছে।

একজন বললো, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়জন বললো, লাইনে কান পেতে দ্যাখ।

প্রথমজন বসে পড়লো। এবার কাত হয়ে লাইনে কান পাতলো।

হ্যাঁ, ট্রেন আসছে। আর দেরি নয়। রেডি হয়ে নে।

সন্ধের অস্বচ্ছ আলো শাল-সেগুনের বনের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছিলো। সেইসব বড় বড় গাছের ছায়া রেললাইনের ওপর পড়েছে। মানুষগুলো এখন ছায়া ছায়া। দু'জন সতর্ক চোখে রেলপথের দু'প্রান্তে তাকিয়ে। একজন রেল লাইনের ফিশপ্লেটের সঙ্গে একটা ধাতব বাক্স লাগিয়ে দিতে ব্যস্ত।

বহুদূর থেকে ট্রেনের আওয়াজ ভেসে আসছিলো বাতাসে।

একজন তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় মেপে নিচ্ছে। ধাতব বাক্সটা লাগানো হয়ে গেছে। লোকটা উঠে পড়লো।

কাজ শেষ?

হুঁ।

ব্যাটারি চালু?

হুঁ।

চেক করে নে।

চেক হয়ে গেছে।

চল তা'হলে।

তিনজন দ্রুত রেলপথ থেকে সেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ক্রমশঃ ঘন অন্ধকার হতে থাকা এই জায়গাটা নিমেষে জনশূন্য হয়ে গেলো। নিথর এই পরিবেশে বহুদূর থেকে ছুটে আসা ট্রেনের গুম্-গুম্ শব্দ একধরনের ভয়াল আতঙ্ক তৈরি করছিলো। দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালাগুলোই একমাত্র তার সাক্ষী। কারণ আর কোন জনপ্রাণী নেই এখন এখানে। মালভূমির উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো জমির ওপর দিয়ে কাঁপা কাঁপা শব্দে ট্রেনের আওয়াজ ভেসে আসছিলো।

বনের মধ্যে তিনটে টর্চের আলো বেশ ভেতরে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়

থেমে গেলো। মাটিতে পড়ে থাকা ছোটখাটো কিছু যন্ত্রপাতির ওপর টর্চের আলো পড়লো। তার পাশে বসে পড়লো একজন। আর একজনের হাতঘড়ির ওপর টর্চের আলো জ্বলছে নাগাড়ে। সেকেন্ডের কাঁটা তিরতির করে ঘুরে চলেছে গোলাকার বৃত্তের মধ্যে। সেকেন্ডের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রেখে লোকটার চোখের মণিও ঘুরে চলেছে একইভাবে।

পাহাড়ী পথ বেয়ে দৈত্যাকার ডিজেল ইঞ্জিন দুরন্ত গতিতে ট্রেনের বগীগুলো নিয়ে ছুটে আসছে।...

অন্ধকার বনের মধ্যে একজনের হাতঘড়ির ওপর টর্চের আলো। সেকেন্ডের কাঁটা ঘড়ির ডায়ালের ভেতর ঘুরেই চলেছে। ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। সেকেন্ডের কাঁটার টিক টিক শব্দ। না কি ওদের বুকের ভেতরে হৃদপিণ্ডের কাঁপুনি শুনতে পাচ্ছে ওরা!

ট্রেন ছুটে আসছে...

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে...

কবজিতে টর্চের আলো...

চোখের মণি দু'টোও ঘুরছে...

জংশন স্টেশনের পাশেই বড় বড় গোটাচারেক হোটেল। তার মধ্যে হোটেল হোয়াইট হর্সের চারতলায় ছ'নম্বর রুমের ভেতর এক অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা নীরবতা নেমে এসেছে। ঘরের মধ্যে দু'জন মানুষ। দু'জনের হাতেই দুটো সেলুলার ফোন। দু'জনই সোফায় বসেছিল। উত্তেজনা সামলাতে না পেরে একজন উঠে পায়চারি করতে শুরু করলো।

আরেকজন টকাটক করে সেলুলারের বোতাম টিপলো।

...স্টেশন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার বুক পকেটে রাখা সেলুলার শব্দ করে উঠতে সে হাতে তুলে নিলো ওটা।

হ্যালো।

আমি বলছি। জগদীশ।

হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।

ট্রেন রাইট টাইমে চলছে তো?

এক্কেবারে পারফেক্ট টাইম। আগের স্টেশন থেকে এক্সপ্রেসটা একেবারে রাইট টাইমে পাস্ করেছে।

আচ্ছা, ছাড়ি।

হোটেলের ঘরে লোকটা কথা শেষ করেই ফের সেলের বোতাম টিপল।

শাল-সেগুনের অন্ধকার বনের ভেতর যে লোকটা হাতঘড়ির দিকে নিবিষ্ট তাকিয়ে ছিলো, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পকেটে সেলুলার ফোন বেজে উঠলো।

হ্যালো?

স্টেশনে ফোন করেছিলাম। ট্রেন রাইট টাইমে চলছে। সব ঠিকঠাক?

হ্যাঁ। ঠিকঠাক।

সাবধান!

এখনো পর্যন্ত।

ছেড়ে দিচ্ছি।

...ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে।

...হোটেলের ছ' নম্বর ঘরে ফের নৈঃশব্দ্য নেমে এলো।

এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের চালকের আসনে বসে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য রাখছিলো চালক। গাড়ির গতি, ডিজেলের রিজার্ভার, এমনকি আবহাওয়ার অবস্থাও। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ছিলো না। নির্দিষ্ট সময়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে এক্সপ্রেস।

মালভূমির বনপথ অন্ধকার হয়ে এসেছে। ডিজেল ইঞ্জিনের হেডলাইটের আলো অন্ধকার কেটে কেটে ছুটছে দ্রুত। চালকের দৃষ্টি এখন সামনে।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছে।

কিন্তু হেডলাইটের আলোর বৃত্তের বাইরে চালকের নজরের আড়ালে বহুদূরে রেল লাইনের ডানদিকে শাল-সেগুনের গাছগুলো নড়ে উঠছিলো বারবার। নড়াচড়া ক্রমশঃ বাড়ছিলো। বনাঞ্চল এবার যেন কেঁপে উঠলো। ভেতরে যেন ঝড় বইছে। না কি ভূমিকম্প! কাদের পায়ের দাপাদাপি শুরু হলো? বনের ভেতর কারা যেন ছুটছে। ছোট ছোট গাছপালা দলে-পিষে পায়ে মাড়িয়ে কতগুলো দৈত্য মাটি কাঁপিয়ে রেললাইনের দিকেই ছুটছিলো।

তীব্র গতিতে ছুটে চলা এক্সপ্রেস ট্রেনের চালকের কেমন যেন একটু অস্বস্তি হচ্ছিলো। নিথর বনাঞ্চলে যেন অন্যরকম পরিবেশ। এমনটা সচরাচর হয় না।

...কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ির ওপর তখনো টর্চের আলো। ঘূর্ণায়মান ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে লোকটার অক্ষিগোলকও ঘুরে চলেছে। পাশের লোকটা একটা চৌকো বাক্সে

হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

হোটেলের ছ'নম্বর ঘরে ফের সেল-ফোনে জানিয়ে দেওয়া হলো, ট্রেন রাইট টাইমেই চলছে।

বনের ভেতরকার দাপাদাপির ঢেউ রেললাইনের খুব কাছে চলে এসেছে। বড় বড় গাছগুলো দারুণ শব্দে দুলছে। একটার সঙ্গে আর একটা গাছের ধাক্কা লেগে যাচ্ছে।

ইঞ্জিনের হেডলাইটের আলো ট্রেনলাইন বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করে সামনে ছুটছিলো। সেই আলোয় এবার ধরা পড়লো এক দারুণ দৃশ্য। চালক চিৎকার করে বলে উঠলো—ও মাই গড!

এত দ্রুতগতির ট্রেনকে যতটা সম্ভব ভ্যাকুয়াম ব্রেক কষে চালক মন্থরগতি করে ফেললো। ট্রেনের প্রত্যেকটা কামরাতে শোরগোল পড়ে গেলো। কেউ সিট থেকে ছিটকে গেলো। বাঙ্ক থেকে অনেকের মালপত্র দুদ্দার করে নিচে পড়লো। যাত্রীদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি, গায়ে গায়ে ধাক্কাধাক্কি হলো। ছোটখাটো আঘাত পেলো অনেকেই। বাচ্চারা কেঁদে উঠলো। মেয়েরা চিৎকার করে উঠলো আতঙ্কে। ট্রেন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুত থেকে মাঝারি গতি, তারপরে ধীর লয়ে চলতে চলতে প্রায় থেমে গেলো। এখন চলছে গড়িয়ে গড়িয়ে।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ট্রেনের ভেতরের প্যাসেজ দিয়ে সামনে ইঞ্জিনের দিকে ছুটলো।

বিস্ময়সূচক সাবধানী হুইসিল বাজিয়ে দিলো ট্রেনচালক—ভোঁও—ভোঁও—ভোঁ-ও-ও-ও-ও। ভোঁও—ভোঁও—ভোঁও-ও-ও-ও।

হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ওদের চরম সময়ের শেষ বিন্দুর মুহূর্ত কয়েক আগে চলছে। চরম সময়ের দিকে পৌঁছতে আর তিরিশ সেকেন্ড। টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দে তির-তির করে এগোচ্ছে সেটা। ছয় থেকে সাত, আট, নয়, দশ, এগারো—এবার এক এক করে বারোর ঘরে পৌঁছনোর আগেই হাত তুললো লোকটা। যে চৌকো টাইপের বাক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারই একটা সুইচ টিপে দিলো সে।

আকাশে আগুনের ঝলকানি। কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দ। অন্ধকার অরণ্য যেন ভূমিকম্পের শব্দ আর কম্পনে চৌচির হয়ে যাবে। ধোঁয়া আর ধুলো রেললাইনের অনেকটা জায়গা অন্ধকারের সঙ্গে আড়ষ্ট বীভৎসতায় ঢেকে দিলো।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দের অনুরণন চলছিলো তখন পর্যন্ত।

ধোঁয়া আর ধুলো সরে যেতে সময় লাগলো আধঘণ্টা খানেক। অন্তত পঞ্চাশ হাত জুড়ে রেল লাইন বেঁকে দুমড়ে গেছে। কংক্রীটের স্লিপার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। বিস্ফোরণের জায়গায় দশ ফুটের মতো গর্ত হয়ে গেছে। আশেপাশের বড় বড় গাছগুলোর কাঁপুনি তখনো থামেনি।

হোটেল হোয়াইট হর্সের চারতলায় ছ' নম্বর রুমে লোকটার হাতে সেলুলার ফোন বাজলো।

হ্যালো?

এগজ্যাক্ট টাইমে কাজ হয়েছে।

রিপোর্ট কী?

এখনো আসেনি।

কেন?

স্টেশনে কোনো খবর আসেনি।

ঠিক আছে। আর দেরি না করে তোমরা ওখান থেকে ব্যাক করো। কুইক! এদিক থেকে লোক গেছে স্পটে। ওরা বুঝে নেবে সব। তোমাদের কাজ এখন শেষ।

সেলফোন বন্ধ করে লোকটা উত্তেজনায় ছটফট করে উঠলো। বিরক্তিতে চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেলো তার।

অপদার্থ। এত বড় একটা কাজ। খবরটা দিতে পারেনি! শালাদের খুন করলেও আশ মিটবে না!

আর নয়। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। বারো ঘণ্টার মধ্যেই এ-সব জায়গা সন্দেহের ব্ল্যাক লিস্টে চলে আসবে।—একথা বললো দ্বিতীয় লোকটা।

হুঁ। কথাটা ঠিক। বেরিয়ে পড়াই ভালো।

হোটেলের ঘরে ওদের কোনো জিনিসপত্র ছিল না। একটা ব্যাগও নয়। দু'জন ছ'নম্বর রুমে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করলো। একজন তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলো। এবার ভাঁজ খুলে লম্বা করে পাকিয়ে নিলো। জ্বলন্ত গ্যাস লাইটারের ওপর ধরলো। কাগজটা পুড়ে পুড়ে কালো ধোঁয়া উঠছিলো।

সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া কাগজটা মেঝেতে ফেলে পায়ে পিষে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা লক্ করে নিচে চলে এলো। সেখানে ক্যাশ কাউন্টারে টাকা-পয়সা দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। এবার একেবারে উধাও হয়ে গেলো লোক দুটো।

সন্ধে ছ'টা দশে পরের স্টেশন পাস করে যাবার কথা ছিল এক্সপ্রেস ট্রেনের।

ছ'টা কুড়ি, ছ'টা পঁচিশ হয়ে গেলো, ট্রেনের পাত্তা নেই। আগের স্টেশনের স্টেশনমাস্টারকে টেলিফোন করা হলো।

হ্যালো, ওয়ান ফিফটি ফোর ডাউন ক'টায় পাস করেছে?

পাঁচটা ছাপ্পান্নয়।

কিন্তু এখনো এখানে আসেনি।

সেকি! কন্ট্রোলকে জানাচ্ছি। খোঁজ নিন। মাঝপথে কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই।

জঙ্গলের ভেতর সরু পায়ে চলা পথে পেন্সিল টর্চের আলো এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নিভছে, আবার জ্বলছে। তিনজন মানুষ যতটা নিঃশব্দে সম্ভব, হেঁটে চলেছে।

হাইওয়ে কত দূর?

দু' কিলোমিটার।

কতটা এলাম?

আদ্দেক রাস্তা এসেছি।

তাড়াতাড়ি পা চালা। জঙ্গল পেরোলে গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়াটাই ডেঞ্জার হবে। বার্স্টিংয়ের ব্যাপারটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে।

হুঁ। ভয় তো সেখানেই। লোকজন তো পিল পিল করে ছুটবে রেল লাইনের দিকে।

আরো মিনিট দশেক হেঁটে ওরা জঙ্গল পেরিয়ে এলো। এবার উঁচু নিচু খোলা জমির ওপর পায়ে চলা সরু রাস্তা। দূরে দু' একটা গ্রামের অবয়ব জমাট বেঁধে আছে।

খানিকটা পথ হেঁটেই ওরা পাকা রাস্তায় উঠে এলো। এবার ওরা ডানদিকে চলতে লাগলো পাকা রাস্তা ধরে। খানিকটা গিয়ে একটা কালভার্ট। কালভার্টের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লো তিনজন।

এই কালভার্টটাই তো?

মনে হচ্ছে। দ্যাখ, থ্রি-ফাইভ-সিক্স লেখা আছে কিনা?

পেন্সিল টর্চের বৃত্তাকার আলো কালভার্টের গায়ে পড়ামাত্রই ইংরাজি সংখ্যায় তিনশো ছাপ্পান্ন লেখাটা ওরা দেখতে পেলো।

ঠিকই আছে।

এখানেই দাঁড়াবো তো?

হ্যাঁ।

রাস্তার পাশে কালভার্টের গা ঘেঁষে তিনটে লোক চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওরা একটু উশখুশ করছিলো।

কি হলো রে? এখনো আসছে না?

ক'টায় আসার কথা?

সাতটা দশ থেকে পনেরোর মধ্যে।—তৃতীয়জন বললো।

এখন কটা বাজে?

একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা সাত।

তাহলে ঠিকই আছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এখান থেকে আরো অনেকটা দূরে ন্যাশনাল হাইওয়ে। সেখান থেকেও গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে।

একটা গাড়ির আওয়াজ খুব কাছে চলে এসেছে মনে হচ্ছে। ওরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

এই পাকা রাস্তাটা হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে বনাঞ্চলের ভেতরে বীট অফিস পর্যন্ত গেছে। মাঝে মাঝেই এই রাস্তায় গাড়িটাড়ি যাতায়াত করে। সামনের বাঁকে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা গেলো। এরা তিন জন সতর্ক।

গাড়ির হেডলাইট তিনবার নিভলো-জ্বললো। এবার একদম নিভে গেছে। বাঁকের মুখেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর এগোচ্ছে না।

একজনের হাতের পেনসিল টর্চ গাড়ির দিকে মুখ করে দু'বার নিভলো-জ্বললো। তক্ষুণি গাড়ির হেডলাইট একবার জ্বলে নিভে গেলো। একজন চাপা স্বরে বললো, সব ঠিকই আছে। ওরা এসে গেছে।

তিনজনই দ্রুত এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। সাদা রঙের আর্মাডা কার। ওরা কাছাকাছি আসা মাত্র গাড়ির পেছনের দিকের একটা দরজা খুলে গেল। ডানদিকের দরজা খুলেছে। সেটাই খোলার কথা। ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে একে একে উঠে পড়লো। গাড়ি স্টার্ট করলো। একটু পিছিয়ে মুখ ঘোরানো হলো। দু'মিনিটের মধ্যেই সাদা রঙের আর্মাডা ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে পড়িমরি করে ছুটলো।

ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে এক দঙ্গল লোক হেঁটে যাচ্ছিলো। সবাই যাচ্ছে রেললাইনের দিকে। ফরেস্টের বীট অফিসের দিক থেকে এসে একটা সাদা রঙের মোটরগাড়ি যে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে সদর শহরের দিকে চলে গেল, সেটা দেখলো অনেকেই। ওরা নানা কথা বলাবলি করছিলো।

এক্কেবারে বোমার শব্দ বটে! নাকি কামান দেগেছে?

কামান কুথা থিকে আইসবে। উ বোমাই বটে!

রকেট হতি পারে।

হুঁ, তা হতি পারে।

রেললাইন ত পগার পার হঁয়্যে গেছে।

হাঁ, ইয়া বড় বড় খাল হঁয়্যেছে শুনা যাচ্ছে বটে।

কাণ্ড বটে হলো একটা!

জব্বর একসিডেন।

এরই মধ্যে একটা পুলিসভ্যান হর্ন দিতে দিতে ছুটে বেরিয়ে গেলো। খানিকবাদে আর একটা।

হাইওয়ের দু'পাশের গ্রামগুলো থেকে অনেক লোক রাস্তায় নেমে পড়েছে।

খবরটা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো—ফরেস্টের ভেতর রেললাইনে বিস্ফোরণ হয়েছে। রেললাইন উড়ে গেছে।

সাদা আর্মাডা কারটা বিস্ফোরণের জায়গার বিপরীতে সদর শহরের দিকে দ্রুত দৌড়োচ্ছিল। অন্যদিকে ভর্তি বন্দুকধারী পুলিস নিয়ে একটা বড় ট্রাককে ছুটে যেতে দেখা গেলো রেললাইনের দিকে। হৈ-চৈ কাণ্ড বেঁধে গেলো এই সন্ধেবেলা।

একটা পুলিসের জিপ রেল লাইনের দিক থেকে ঘুরে সদরের দিকে ছুটে আসছে। এক দঙ্গল গ্রামের লোকজনকে দেখে লালরঙের জিপ দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখ বাড়ালো টুপি পরা এক পুলিস অফিসার।

এখান দিয়ে কোন অচেনা লোকজনকে যেতে দেখেছো?

না। তবে ফরেস্ট অপিসের পথ দিয়ে একটা সাদা গাড়ি তো চলে গেল।

কখন?

এই তো! এই মাত্তর।

কোন দিকে গেলো?

সদরের দিকে।

বীট অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা?

আপিস থেকে কি না বলতে পারবক লাই বটে। তবে উ রাস্তা থিকেই বেরাইছে।

পুলিস ভ্যান দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ফরেস্টে যাবার পাকা রাস্তায় ঢুকে পড়লো। দুই চক্ষু হেডলাইট অন্ধকার ফুঁড়ে অরণ্যের মাঝপথ বরাবর গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটতে শুরু করেছে তখন।

হাইওয়ের পাশে মস্তো একটা ধাবা তখন জমজমাট। রাস্তার ধারে গোটা ছয়েক ট্রাক দাঁড়িয়ে। ট্রাক ড্রাইভার আর খালাসীরা ধাবায় খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছিলো।

কোণের দিকে টেবিলে এসে বসলো দু'জন লোক। বয় এসে দাঁড়ানো মাত্রই ওরা অর্ডার দিলো, দু'প্লেট তড়কা, আটটা করে রুটি।

মাটন তড়কা? না এগ?

মাটন তড়কা।

বয় চলে যেতেই একজন পকেট থেকে সেলুলার বের করলো। এদিক-সেদিক তাকিয়ে ঝটপট করে বোতাম টিপলো। এবার কানের সঙ্গে চেপে ধরলো বাঁ হাত। সঙ্গের লোকটা উৎসুক চোখে তাকিয়ে।

ধাবায় যে-সব ড্রাইভার ও খালাসীরা খাওয়া-দাওয়া করছিলো, তাদের অগোচরেই সেলফোনে কথা বলার চেষ্টা করছে লোকটা।

হ্যালো, তোমরা কোথায়?

হ্যাঁ, আমরা টাউনে ঢুকে পড়েছি। গাড়িতে আছি। কোথায় উঠবো?

একই জায়গায়। কোন চেঞ্জ হয়নি।

স্পটের খবর কি?

কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। পুলিস আর মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে। বোম স্কোয়াড নেমে পড়েছে। গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে পরিষ্কার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

রিস্ক নিতে হবে না। কাল বাস ধরে জায়গামতো চলে যাবে। সব যখন ঠিকঠাক ছিলো, কাজ হয়েছে ঠিকই।

হ্যাঁ, আমরা সময় মেপে ঠিকমতই কাজ সেরেছি। কোনও ভুল হয়নি।

বাবু, রুটি তড়কা।—

ধোঁয়া ওঠা গরম দুটো তড়কার প্লেট এনে রাখলো হোটেল-বয়। ফের দৌড়ে গিয়ে দুটো প্লেটে রুটি নিয়ে এলো। এবার জলের গ্লাস।

ধাবার মালিক কাউন্টার থেকে জোরে চিৎকার করে বয়কে ডাকলো, আরে এ ভজা, দু'নম্বর টেবিলে জল দিসনি এখনো!

যাচ্ছি, যাচ্ছি!

টেবিলের লোকটা তখনই সেলুলার বন্ধ করে পকেটে পুরলো। এক পলক ধাবার মালিকের নজরে পড়লো তা। মনে রাখার মতো তেমন কোন ব্যাপার নয়। মালিক ফের দোকান সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে লোকদু'টো উঠে পড়লো। কাউন্টারে গিয়ে টাকা-পয়সা মিটিয়ে ওরা রাস্তায় নামলো।

ধাবার কাছাকাছি রাস্তার পাশে ছ'টা ট্রাক দাঁড়িয়েছিলো। দু'জন সেগুলো পেরিয়ে আরো সামনে এগলো। এবার অন্ধকার। দু'জনেই বেশ সতর্কভাবে এদিক-সেদিক দেখে নিচ্ছিলো। ধাবার জমজমাট এলাকাটুকু পেরিয়ে ওরা একটু জোরে হাঁটতে শুরু করলো। খানিক এগিয়ে একটা গাছের ঘন ছায়ায় আড়াল নিয়ে দু'জনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো। খানিকক্ষণ দাঁড়ালো। ওরা বুঝতে চাইছিলো, কেউ ওদের

খেয়াল করেছে কি না, অথবা কেউ অনুসরণ করছে কি না।

মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে ওরা আরো খানিকটা সোজা হাঁটলো। এবার ডানদিকে ইঁটের রাস্তা সামনের গ্রামটার দিকে নেমে গেছে। একজন পেন্সিল টর্চ বের করলো পকেট থেকে। সেটা জ্বালিয়ে বরাবর ইঁটের রাস্তাটা এক নজর দেখে নিলো। এবার ওরা সেই রাস্তায় নেমে দ্রুত গ্রামের দিকে হাঁটা লাগালো।

ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে খানিকটা যাবার পরই ইঁটের রাস্তা গ্রামের গাছপালার আড়ালে চলে গেল। লোক দু'জনও হারিয়ে গেলো সেই অন্ধকারে।

ফরেস্টের বীট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিসের দলটা বীট অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল।

তাহলে আজ কোন সাদা রঙের গাড়ি আপনাদের এখানে আসেনি? যায়ওনি, তাই তো!

হ্যাঁ। বাইরের কেউই আজ আসেনি এখানে। কেন? কি হয়েছে বলুন তো!

রেললাইনে একটা বড় ধরনের বার্স্টিং-এর ঘটনা ঘটেছে। সাডেনলি এটা সাবোতাজ।

তাই নাকি!

কাইন্ডলি একটু কেয়ারফুল থাকবেন তো। সন্দেহজনক কিছু শুনলে বা দেখলে একটু আমাদের জানাবেন।

পুলিস অফিসার ওয়্যারলেস-এর সুইচ অন করলেন।

হ্যালো, আমি প্রবীর ঘোষ বলছি। রাঙাপাড়া ফরেস্টের বীট অফিস থেকে।

কোন খবর আছে?

না, শুধু গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে একটা সাদা গাড়ির খবর পাওয়া গেছে, ওটা টাউনের দিকে গেছে।

কেমন গাড়ি?

ওরা তো বলছে জিপের মতো। আর্মাডা, না হলে টাটা সুমো হতে পারে। একটু ওয়াচে রাখুন। আপাততঃ আর কোন খবর হাতে নেই।

এক্সপ্রেস ট্রেনটার অবস্থা কী?

ওয়্যারলেসে বলা যাবে না। আমি যাচ্ছি দু'-এক ঘণ্টার মধ্যে। ওভার।

যে লোক দুটো হাইওয়ে থেকে গ্রামের পথে নেমে হারিয়ে গিয়েছিলো, সেই লোক দুটোকে দেখা গেল গ্রামের স্কুলবাড়ির দারোয়ানের কোয়ার্টারের ভেতর। ওরা দারোয়ানের সাথে হালকা চালে কথা বলছিল।

রেললাইন উড়ে গেছে! তাই নাকি! কিভাবে উড়লো?

বোমা-টোমা ফাটিয়েছে।

কারা ফাটালো?

তা কি করে বলবো! আমি হেডস্যারের বাড়ি গেছিলুম। হেডস্যার বললেন, জগু, ঘটনাটা শুনেছো? তা আমি বললুম, গাঁয়ের লোকজন কি সব বোমা রকেট এইসব কথা বলছিলো। তবে জোর আওয়াজ শুনেছি সন্ধেবেলা।

বলো কি জগন্নাথদা!

আমরা টাউনে গেলাম, তার মধ্যে এত কাণ্ড! তা হেডস্যার কিঁ বললেন, ট্রেন-ফ্রেন উড়ে গেছে?

না, সেরকম কথা তো হেডস্যার কিছু বললেন না। শুধু বললেন, জায়গাটা মিলিটারিতে নাকি ঘিরে ফেলেছে।

লোকজন মরেছে, এমন কথা বললেন হেডস্যার?

তাও কিছু বলেনি। শুধু বললে, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

পরিষ্কারভাবে কোন খবর জানতে না পেরে ওরা একটু হতাশ হলেও মুখে তা প্রকাশ করলো না। বললো, জগন্নাথদা, আমরা তাহলে শুয়ে পড়ি। কাল সকালে ফের টাউনে যেতে হবে।

ঠিক আছে—বলে দারোয়ান জগন্নাথ মাহাতো ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই ওরা ঘরে খিল তুলে দিল। ঘর বন্ধ করেও ওরা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। ফের খিল খুলল। উঁকি মেরে বাইরেটা আর একবার দেখে নিল। হ্যাঁ, জগন্নাথ মাহাতো নিজের ঘরে চলে গেছে। সে তার বউ ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলছে। তার ঘরের ভেতর থেকে বাচ্চাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিলো।

নিশ্চিন্ত হয়ে এরা ফের দরজায় খিল তুলে দিলো। একজন খাটে মশারি টাঙাচ্ছিলো। সে বললো, রোজ রোজ মশারি টাঙাতে ভালো লাগে?

যা হাতির মতো এক একটা মশা! কামড়ালে নিঘঘাৎ ম্যালেরিয়া। শেষ দিন ম্যালেরিয়া সঙ্গে নিয়ে যাবো নাকি!

আরে সেই জন্যই তো মশারিটা টাঙাচ্ছি। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখো। ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে পড়তে হবে। ঘণ্টা ছয়েক ঘুমোতে পারলে কাল সারাদিন দৌড়োনো যাবে।

টেবিলে রাখা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে প্রথম লোকটা মশারির ভেতর ঢুকে পড়লো। ওরা চুপচাপ হয়ে গেলো। কান খাড়া করে ঘরের বাইরের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছিলো দু'জনেই।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ওরা দু'জনেই নিচু গলায় কথা শুরু করলো।

একজন বেশ হতাশভাবেই বললো, শেষ পর্যন্ত কি রেজাল্ট হলো, কিছুতেই জানা যাচ্ছে না!

পুলিস সব সীল করে দিয়েছে। কিছু একটা ঘটেছেই। না হলে পুলিস সব গোপন রাখতে চাইছে কেন?

দুটো কারণ হতে পারে। এক, পুরো ঘটনার ব্যাপারে পাবলিককে অন্ধকারে রাখলে সারা দেশে রিঅ্যাকশন কম হবে। দুই, আমাদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা ওরা করবেই।

ব্যস, আর খোঁজখবর নেবার দরকার নেই। কাল ভোরে এখান থেকে একেবারে ধাঁ। কোনরকম কিউরিসিটির দরকার নেই আর। ফাঁদে পড়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার।

তবু ব্যাপারটা না জেনে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

ব্যাপার জানলেও যা, না জানলেও তাই। যা হওয়ার তাই হয়েছে। এখন আর কিছু করার নেই। আর কোনো কথা নয়। এবার শুয়ে পড়া যাক।



ধোঁয়া আর ধুলোয় ঢেকে গেল রেললাইন

দুই

সদর থানার গেটের সামনে পুলিস জিপ ছুটে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো। জিপ থেকে নেমে সেই অফিসার প্রায় ছুটতে ছুটতে থানায় ঢুকে পড়লেন। তারপর একদম অফিসার ইন-চার্জের ঘরে।

বসুন, বসুন! উত্তেজিত লাগছে কেন? সিরিয়াস কিছু?

নাথিং! সন্ধে সাতটা থেকে এই এখন রাত একটা বাজে। নিট রেজাল্ট জিরো।

টেলিফোনে যে বললেন, একটা অচেনা সাদা গাড়ি দেখা গেছে!

ওই পর্যন্তই! তারপর আর কোনো খোঁজ নেই।

আরে প্রবীরবাবু, এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিলে চলে! ওই সাদা গাড়িটার পেছনে একটু লেগে থাকুন। ধৈর্য ধরুন। সবুর করুন। সবুরে যে মেওয়া ফলবে না, এমন কোন কথা নেই।—ওসি হাসতে হাসতে বললেন অল্পবয়সী সেকেন্ড অফিসারকে।

ও-সির টেবিলের সবুজ টেলিফোন বেজে উঠলো।

প্রবীরবাবু, বসুন।—বলে ও-সি টেলিফোন ধরলেন।

হ্যালো!

হ্যাঁ স্যার, আমি শঙ্কর!

কি খবর?

শহরে মোট চারটে সাদা গাড়ির খোঁজ পাওয়া গেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। যা জানতে পেরেছো, টোটালটা প্রবীরবাবুকে গুছিয়ে বলো ঝটপট। দেরি করা যাবে না।

নিন প্রবীরবাবু, শঙ্করের কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন নিয়ে নিন।

প্রবীর ঘোষ টেলিফোন কানে লাগিয়েই বললেন, শঙ্কর, কি বলছো, বলো।

স্যার, টাউনে আজ রাতে মোট চারটে সাদা গাড়ি দেখেছি। একখানা স্টেশন রোডের চালের আড়তদার দীনেশ চাকলাদারের ঢাকা গাড়ি। আর একটা গাড়ি রেড ক্রসের সিম্বল লাগানো। ওটা আমাদের হাসপাতাল কম্পাউন্ডে রয়েছে। আরো একটা পুরনো সাদা রঙের ঢাকা ভ্যান গাড়ি মুখুজ্জেপাড়ার গ্যারেজের সামনে রাখা আছে। ওটা খারাপ। ঝকঝকে সাদা রঙের একখানা আর্মাডা কার গুড্ডু সিং-এর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

লাট মহল্লায় গুড্ডু সিং-এর বাড়ির সামনে?

হ্যাঁ।

ফরেন মানির দু'নম্বরী কারবার করতো না গুড্ডু সিং?

এখনো করে।

ও কি রিসেন্ট কোনো আর্মাডা কার কিনেছে নাকি?

জানি না।

ঠিক আছে। আর্মাডা কারটা ওয়াচে রেখো।

সবগুলোকেই ওয়াচে রেখেছি।

ভেরি গুড। আধঘণ্টা বাদে এখানে ফের ফোন করবে।

আচ্ছা।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে প্রবীর ঘোষ ওসি-কে বললো, স্যার, শরীর আর বইছে না। একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছি। শঙ্করের ফোন এলে ডাকবেন।

ঠিক আছে। তবে আমাদের এলাকায় এতবড় ঘটনা। কাল থেকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কিছু একটা করে না দেখাতে পারলে পুলিসের নামে যা খুশি বলবে খবরের কাগজগুলো।

হুঁ, বুঝতেই পারছি। খাটতে খাটতে দমবন্ধ অবস্থা হবে আর কি!

আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়লো। আপনার সেই পরিচিত ডিটেকটিভ কেদার মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

অনেকদিন ধরেই যোগাযোগ নেই। কেন?

ওনাকে একটু খবর পাঠান তো! যদি সময় থাকে এক্ষুণি এখানে চলে আসতে বলুন।

এত রাতে আর টেলিফোনে ডাকাডাকি করবো না। কাল সকালে বলবো।

ঠিক আছে।

এখন ভোর চারটে। লোক দুটো ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে উঠে পড়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো। সামান্য কিছু জিনিসপত্র যা ছিল একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগে ভরে নিয়েছে ওরা। বাইরে বেরিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে ওরা দারোয়ান জগন্নাথের ঘরে টোকা দিল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ফের টোকা দিল একটু জোরে।

ভেতর থেকে জগন্নাথের ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল—কে?

আমরা। জগুদা, একটু দরজা খোল। চাবিটা দিয়ে যাই।

জগন্নাথ দারোয়ান দরজা খোলামাত্র ওরা চাবি দিয়ে বললো, আমরা চললাম। এই নাও, তোমার আরো পাঁচশো টাকা। পরে আবার দরকার হতে পারে। তখন ফের ঘরটা ভাড়া নেব।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নগদ পাঁচশো টাকা পেয়ে জগন্নাথ মাইতি বেজায়

খুশি। সে একেবারে বিগলিত হয়ে বলল—অবশ্যই, অবশ্যই!

আর দেরি না করে লোক দুটো রাস্তায় নেমে দ্রুত হাইওয়ের দিকে হাঁটা দিল। একজন বলল, চারটে কুড়িতে ফার্স্ট বাস। তাড়াতাড়ি পা চালা।

দশ-বারো মিনিট হেঁটে ওরা হাইওযের ওপর চলে এলো। বাসে উঠেই ওরা কন্ডাক্টারকে টাকা দিয়ে বললো, আলুন্দিয়ার মোড়ে নামব। দুটো টিকিট দিন।

হাইওয়ে ধরে ভোরের বাস সদর শহরের দিকে ছুটে চলেছে তখন।

লাট মহল্লায় গুড্ডু সিং-এর বাড়ি ছাড়িয়ে প্রায় হাজার গজ দূরে ফ্রেন্ডস লজ আবাসিক হোটেল। সেই হোটেল থেকেই পুলিসের লোকজন সাদা আর্মাডা গাড়িটাকে নজর রাখছিল। ফ্রেন্ডস লজের রাস্তার দিকে দোতলা আর তিনতলায় ঢালাও টানা বারান্দা। প্রত্যেকটা রুমের পেছনের দরজা সেই বারান্দার দিকে। তিন তলায় একশো ছেচল্লিশ নম্বর রুমে ছিল সেই তিনজন লোক, যারা গত সন্ধেবেলা বনের মধ্যে বসে যন্ত্রপাতি দিয়ে রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

এখন বাজে চারটে পঞ্চাশ। হোটেলের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসেছিল শঙ্কর। সে নিজেই সাদা আর্মাডা গাড়ি নজরে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল।

একশো ছেচল্লিশ নম্বর রুমে বেশ তৎপরতা চলছিল। লোক তিনটে ঘুম থেকে উঠে জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে একজন পেছনের জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখছিল। একেবারে বরাবর তাকালে গুড্ডু সিং-এর বাড়ি। তার নিচেই গাড়িটা দাঁড় করানো আছে।

লোকটার মনে কিছু একটা সন্দেহ জেগেছে মনে হচ্ছে। সে ঘন ঘনই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল। এবার ঘরের মধ্যিখানে এসে বললো, রাম, আমার কেমন যেন লাগছে!

কেন? কি হলো!

কেমন যেন একটা থমথমে চুপচাপ লাগছে চারধারটা।

ভোরবেলা কি সবাই রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচামেচি করবে নাকি! শুনছিস ভরত, লক্ষ্মণের কথাবার্তা!—দ্বিতীয়জন তৃতীয় জনকে বলল। প্রথমজন কিন্তু এই হালকা কথায় কান দিল না। সে ফের পেছনের জানালায় বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। তারপর ইশারায় দুজনকে ডাকল। মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলে সে ওদের ঘরের জানালার ঠিক ওপাশে টানা বারান্দায় একটা টুলে বসে থাকা একজনকে তর্জনি তুলে দেখালো।

একটু লক্ষ্য করে দেখ, লোকটা আমাদের আর্মাডা গাড়িটা দেখছে। কন্টিনিউ। আমি যতবার দেখছি, লোকটা একভাবে তাকিয়েই আছে।

খোচর নয় তো!

সে-রকমই গন্ধ পাচ্ছি।

গাড়িটায় গেলে রিস্কি গেম হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। কি করা যায় তাহলে?

এক কাজ করো।

কী?

ভরত, তুমি এক্ষুণি আলুন্দিয়ার মোড়ে চলে যাও। ওরা দু'জন বাস থেকে নেমে বটগাছের নিচে চায়ের দোকানে বসে থাকবে। ওদের গিয়ে বলো, দুর্গাপুরের বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে। বলেই চলে আসবে। একটু পরে গিয়ে আমরা ওদের ধরে নেব। এক্ষুণি যাও।

ভরত নামের লোকটা যখনই ঘরের দরজা খুলে করিডরে পা রাখল, তখনই পেছনের বারান্দার টুল থেকে উঠে পড়ল শঙ্কর। রাম আর লক্ষ্মণ সেটা দেখল।

প্রায় একই সময় একজন সামনের সিঁড়ি দিয়ে, আর একজন পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারের সামনে চলে এল।

শঙ্কর কাউন্টারে এসেই থানায় ফোন করল।

হ্যালো, সদর থানা!...

...হ্যাঁ, শঙ্কর বলছি। একটু প্রবীরবাবুকে দিন...প্রবীরবাবু!...হ্যাঁ গাড়িটা ওখানেই রয়েছে...আচ্ছা, আমি থাকছি...ঠিক আছে। ছাড়ছি।

হোটেল থেকে বেরোতে গিয়েও বেরোয়নি ভরত। ফোনের এদিক থেকে বলা শঙ্করের কথাগুলো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনে নিল সে। তারপরই ছুটল আলুন্দিয়ার মোড়ে। আলুন্দিয়ার মোড়ে বটগাছের নিচে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল সেই দু'জন। যাদের স্কুলের দারোয়ান জগন্নাথ মাইতির বাড়িতে দেখা গিয়েছিল।

লোক দু'টোকে ইশারায় ডাকল ভরত। ওরা দোকানের বাইরে চলে এলো।

তোরা হোটেলের কাছে যাস না। দুর্গাপুরের বাসস্ট্যান্ডের কাছে চলে যা।

কেন?

প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়েছে। বেশি দেরি না করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে যাবি।

কথাবার্তা বলে ভরত আর দাঁড়ালো না। দ্রুত ছুটল ফ্রেন্ডস লজের দিকে।

অপরাধীরা জেনে ফেলল, পুলিস তাদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ভরত হোটেলের তিনতলায় একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘরে রাম আর লক্ষ্মণকে জানিয়ে দিল শঙ্করের থানায় টেলিফোনের কথা। ওরা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, শঙ্কর ফের তিনতলার বারান্দার টুলে বসে সোজাসুজি গুড্ডু সিং-এর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। শঙ্কর জানলও না, যাদের ধরবার জন্য ওরা জাল পেতেছে, তারাই শঙ্করকে

আগে চিনে ফেলেছে।

ওরা চলে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি করছিল। তখনই কলিং বেলের শব্দ। ওরা চমকে গেল। কিছু কাগজপত্র বিছানার ওপর পড়েছিল। তাড়াহুড়ো করে সেগুলো বিছানার নিচে গুঁজে দিল ওরা। আশঙ্কায় তিনজনের কপালেই বিন বিন করে ঘাম ফুটে উঠেছে। পুলিস কি ওদের কথা জেনে ফেলেছে?

তবুও ওরা পেশাদার অপরাধী। সবরকম পরিস্থিতির জন্যই ওরা তৈরি থাকে। লক্ষ্মণ গিয়ে দরজার লক্ খুলে দিল।

হোটেল বয় ট্রে-তে করে গরম চা আর স্ন্যাকস বিস্কুট নিয়ে হাজির। দেখে ওদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো যেন।

চা-টা খেয়ে ওরা তিনজন দশ মিনিটের মধ্যে নিচে নেমে পড়লো। কাউন্টারে গিয়ে টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। তারপর সোজা দুর্গাপুর যাবার বাস স্ট্যান্ডে। ভোর সোয়া পাঁচটার বাসে এরা পাঁচজন ওদের পক্ষে বিপজ্জনক এই শহর ছেড়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল।

ফ্রেন্ডস লজের তিন তলার বারান্দায় বসে হাজার গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আর্মাডা গাড়িটার দিকে তখনো নজর রাখছিলো শঙ্কর। শঙ্কর জানতেই পারল না, অপরাধীরা ওর নাকের ডগা থেকে দিব্যি আরামসে পালিয়ে গেল। গুড্ডু সিং-এর বাড়ির সামনে আর্মাডা গাড়িটা মালিকবিহীন অবস্থায় সারাদিন পড়ে রইল। দুপুরের পর পুলিস এল। গাড়ির ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারল না।

দুর্গাপুরে বাস এসে পৌঁছলো বেলা এগারোটায়। বাস থেকে ওরা পাঁচজন একসঙ্গে নামল ঠিকই, কিন্তু একসঙ্গে রইল না। কেউ যাতে কোনরকম সন্দেহ করতে না পারে, পাঁচজনই তাই আলাদা হয়ে গেল। প্রত্যেকেই নিজের মতো চায়ের দোকানে ঢুকে চা-টিফিন সেরে নিল। তারপর পরিকল্পনা মতো কেউ বাসে, কেউ রেল স্টেশনের দিকে চলে গেল যার যার গন্তব্যে পৌঁছোবার জন্য।

এর মধ্যে যার সাঙ্কেতিক নাম ছিল রাম, সেই হল এই দলের মাথা। সে বাস টার্মিনাসের ভেতরই একটা রেস্টুরেন্টে বসে পেটপুরে ডালপুরি খেল। এর আচার-আচরণ দেখে মনে হবে, যেন অঢেল সময় তার। কোন তাড়াহুড়ো নেই। সে একটা চা খাবার পর সিগারেট ধরালো। আয়েস করে অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খেল। ফের বলল, দাদা, একটা স্পেশাল চা দিন তো বড় করে।

বড় স্পেশাল চা তিন টাকা লাগবে।

ঠিক আছে। দিন না। আপনাদের এখানে খবরের কাগজ ক'টায় আসে?

এই তো আসার টাইম হয়ে গেছে।

শুনে আর বেশি কিছু বলল না রাম। যতটা সম্ভব মাপা কথা বলে সে। দুর্গাপুরের কেউই বিস্ফোরণ নিয়ে কোন কথা বলছে না। এই ব্যাপারটা ওর কাছে ভারী আশ্চর্যের লাগল। তবু সে এই নিয়ে কোনরকম কৌতূহল দেখাল না। কোথায় কোন ফাঁকে পুলিসের চর বসে আছে, কে জানে! বেফাঁস কিছু বলে ফেললে ক্যাঁক করে ধরবে এসে।

চা-টা খেয়ে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে রাম বেরিয়ে পড়লো রেস্টুরেন্ট থেকে। রাস্তায় নেমে একটা রিকশা ধরলো।

কোথায় যাবেন বাবু?

স্টেশনে চলো। আচ্ছা, স্টেশনে খবরের কাগজ পেয়ে যাবো তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্ল্যাটফর্মেই বইপত্রের দোকান আছে একটা। ওখানে বাংলা, ইংরিজি, হিন্দি সব কাগজই থাকে।

রাম যখন দুর্গাপুর স্টেশনে এল, তখন বেলা পৌনে বারোটা বাজে। প্লাটফর্মে ঢুকে সে ম্যাগাজিনের স্টলে গিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনল। কাগজটা নিয়ে চলে গেল প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে। সেখানে একটা বকুল গাছের নিচে সিমেন্ট-বাঁধানো বসার জায়গা ছিল। তাতে বসে সে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখা শুরু করল। ওপরের হেডিং-এ দেশের রাজনৈতিক খবরই ছিল। ও খানিকটা অবাক হচ্ছিল, এতবড় ট্রেন বিস্ফোরণের খবর প্রথম পাতার হেডিং-এ নেই দেখে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পাতায় গিয়ে ডানদিকের ওপরের খবরে ওর চোখ আটকে গেল। ও সাঙ্ঘাতিক ধাক্কা খেল। ও প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল। হৃদপিণ্ডের দপদপানি বেড়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে খবরটা পড়ে ফেলল সে। তারপরই লেখা অক্ষরগুলো যেন ঝাপসা হয়ে গেল তার চোখের সামনে। সাঙ্ঘাতিক এক অবসাদ যেন লোকটাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। সেই বকুল গাছের তলায় দুহাতে মুখ গুঁজে লোকটা বহুক্ষণ বসে রইল।

•

সকালবেলা প্রবীর ঘোষের টেলিফোন পেয়ে গোয়েন্দা কেদার মজুমদার মনস্থির করেই ফেলেছিলেন, আজই রওনা দিয়ে দেবেন। হাতে তেমন কোন কেসও নেই। তাই এত বড় একটা ঘটনায় যখন ডাক পড়েছে, সেটা ছেড়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাসিস্ট্যান্ট বদ্রীর সাথে মোটামুটি আলোচনা সেরে নিয়ে কেদার তাই দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন, যাতে বিকেল বিকেল পৌঁছে যাওয়া যায়।

প্রবীর ঘোষ কেদার-বদ্রীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এই ফ্রেন্ডস লজেই।

সবটাই কেমন কাকতালীয় হয়ে গেল। রহস্য এবং রহস্যের উদঘাটন সবটাই অদ্ভুতভাবে ফ্রেন্ডস লজ আবাসিক হোটেলকে ঘিরে এগোতে লাগল।

দোতলার একেবারে শেষ প্রান্তে কেদার-বদ্রীর ঘরের নম্বর হল ছিয়াত্তর। এখন বিকেল সোয়া চারটে। প্রবীর ঘোষ টেলিফোন করে হোটেল ম্যানেজারকে ওদের জন্য একটা ঘর রেখে দিতে বলেছিলেন। সেইমতোই কেদার-বদ্রী বাস থেকে নেমে সোজা হোটেলে এসে নিজেদের ঘরে ঢুকে সামান্য খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিল।

বদ্রী সঙ্গে করে একটা গল্পের বই নিয়ে এসেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের নিচে বালিশ রেখে বদ্রীনারায়ণ বই পড়ছিলো। কেদার পাশের বেডে চুপচাপ শুয়েছিলেন। খানিকক্ষণ পরে কেদার কথা বললেন।

পরিবেশটা কেমন যেন থমথম করছে! তাই না?

বদ্রীনারায়ণের পুরো মনোযোগ ছিল বইয়ের ভেতর। মুখ তুলে তাই সে জিজ্ঞেস করল, কি বললে কেদারদা?

বলছি, পরিবেশটা যেন স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি চুপচাপ।

কথাটা শুনে বদ্রী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, ঠিকই ধরেছ কেদারদা। এই হোটেলটাও অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ। কোথায় কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে!

কলিং বেল বেজে উঠলো। বদ্রী ছুটে গিয়ে দরজা খুললো। সদর থানার সেকেন্ড অফিসার প্রবীর ঘোষ ঘরে ঢুকলেন।

তা হলে কেদারবাবু, ডাকামাত্রই আসতে হল। কোন অসুবিধে হয়নি তো?

বরং সুবিধেই হল।

কি রকম?

এই যে, ইন্টারেস্টিং কাজ পাওয়া গেল! ঘরে বসে তো বোর হচ্ছিলাম।

প্রবীরবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

আগে কাজের কথা বলি। আপনাদের টোটাল ইনফরমেশন দিয়ে দিই।

বলুন!

প্রথমতঃ, আজকের কাগজে খবরটা নিশ্চয়ই দেখেছেন?

পড়লাম। পড়ে তো মনে হল একেবারে নবিশ লোকজনের কাজ।

না। বরং তার উল্টো। চূড়ান্ত পেশাদার, বিবেকহীন খুনীরা পাকা প্ল্যানে এই কাজ করেছে।

কিন্তু কাগজের রিপোর্টে তা তেমন বোঝা যাচ্ছে না!

আমরা সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ঘটনাস্থল নিশ্ছিদ্র ঘিরে ফেলেছিলাম। একটা

মশাও ঢুকতে দিইনি। কোন খবর বাইরে লিক্ করেনি। রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারদের নিয়ে গিয়ে সেন্সরড খবর আমরা দিয়েছি। যাতে অপরাধীরা ভুল পথে চালিত হয়।

হুঁ, বুঝলাম।

এমনভাবে আজকের খবরের কাগজে রিপোর্টটা প্লেস করা হয়েছে, যাতে খবর পড়ে অপরাধীরা পুরো হতাশ হয়ে পড়ে।

কিন্তু কাগজে তো দেখলাম ট্রেনটা বেঁচে গেছে। সন্ত্রাসবাদীদের ক্যালকুলেশন ঠিক হয়নি। ট্রেন আসার অনেক আগেই রিমোট কন্ট্রোলে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

সেটা সত্যি নয়।

তা হলে সত্যিটা কী?

কেদার-বদ্রী দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল প্রবীর ঘোষের দিকে।

প্রবীরবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। কেদার-বদ্রী আসল ঘটনা জানার জন্য উদগ্রীব। প্রবীর ঘোষ শুরু করলেন—

বিস্ফোরণ সঠিক সময়ে সঠিক জায়গাতেই হয়েছে। ট্রেনের টাইম, গতিবেগ সব কিছু ক্যালকুলেশন করে পাক্কা সময়ে অত্যন্ত দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীরা এই কাজ করেছে।

তবে?—কেদাব-বদ্রী দু'জনের চোখে-মুখে বিস্ময়।

আপনারা দু'জন যেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন, তার থেকেও বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এক্সপ্রেস ট্রেনের ড্রাইভার হরজিন্দার সিং এবং তাঁর দুই সহকর্মী।

কেন?

দারুণ সুন্দর একটা দৃশ্য দেখে।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় দারুণ দৃশ্য! খুলে বলুন তো মশাই!

সবুর সবুর! এ-পর্যন্ত এই ঘটনা জানে আমাদের সদর থানার ওসি, মিলিটারির রিজিওনাল কমান্ডার ছাড়া দু'জন মেজর এবং আমি। এবার জানবেন আপনারা দু'জন।

কেদার এবং বদ্রী দু'জনেই আসল তথ্যটা জানার জন্য উৎসুক। বদ্রী মনে মনে ভাবছিলো, ঘটনা যাই হোক, এতগুলো লোক প্রাণে বেঁচে গেছে, এটাই বড় কথা।

প্রবীরবাবু সিগারেটের শেষ অংশটুকু অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, ডিজেল ইঞ্জিনের ড্রাইভার হরজিন্দার সিং এবং তাঁর সঙ্গীরা ঘটনার মিনিট দশেক আগে দেখতে পেয়েছিলেন ট্রেন লাইনের একধারের শাল-সেগুনের বনে যেন প্রলয় হচ্ছে, এমন অসম্ভব কম্পন। বড় বড় শাল-সেগুন গাছগুলো যেন ভেঙে

পড়তে চাইছিল। গভীর বনাঞ্চলে যেন ভূমিকম্প হচ্ছিল। খানিক পরেই সামনে রেল লাইনের ওপর এক অসাধারণ দৃশ্য ওঁদের নজরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার অত জোরে ছুটে আসা ট্রেনকে অল্প ব্রেক কষে গতি কমাতে কমাতে সম্পূর্ণ থামিয়ে ফেলে। এছাড়া ড্রাইভারের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।

আরে, আসল ঘটনাটা কি? সেটা বলুন! কি এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখল ট্রেনের ড্রাইভার।

ড্রাইভার দেখেছিল, দলমা পাহাড় থেকে নেমে আসা এক দল হাতি সেই শাল-সেগুনের বনের ভেতর দাপাদাপি করে উঠে এসেছে রেল লাইনের ওপর। রেল লাইনের ওপর সার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফের তারা অপর পারের বনের ভেতর নেমে যায়।

ওরে বাব্বা! এ-তো দারুণ ব্যাপার! এই জন্য এত বড় ম্যাসাকার থেকে এতগুলো মানুষ বেঁচে গেছে!

হ্যাঁ। ট্রেনের প্রায় সব যাত্রীই দেখেছে সেই হাতির পাল। অনেকে ছবিও তুলে নিয়েছে। বিস্ফোরণের জায়গা থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে যখন সেই সাঙঘাতিক বিস্ফোরণ ঘটলো, তখন নাকি হাতির পালের রেল লাইন ক্রস করা শেষ হয়নি।

ওঃ। এ তো হাতির পাল নয়, যেন দেবদূত!

হ্যাঁ, সে রকমই ব্যাপার বটে।

কোন খবরের কাগজেই এই ঘটনার উল্লেখ নেই।

ওরা যে সন্ত্রাসবাদী দলটাকে পাঠিয়েছিল, তাদের কাজকর্ম নিয়ে ওরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ুক, এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই এই ঘটনা আমরা নিউজপেপারকে দিইনি।

ফের কলিং বেলের শব্দ হল।

বদ্রী দরজা খুলে দিল।

দেখা গেল, সামনে শঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে।

আরে শঙ্কর, এসো, ভেতরে এসো। কোনো খবর আছে নাকি?

হ্যাঁ স্যার, সিরিয়াস ব্যাপার। ক্রিমিনালগুলো আমাদের বড়সড় একটা ধোঁকা দিয়েছে।

কি হয়েছে?

আমরা মোটামুটি কনফার্ম, গুড্ডু সিং-এর সঙ্গে ওই সাদা আর্মাডার কোন সম্পর্ক নেই।

তবে?

এই হোটেলের একজন দারোয়ান আমাকে বলল, সাদা আর্মাডা করে তিনজন লোক এসেছিল। ওরা এই ফ্রেন্ডস লজেই উঠেছিল। ঘর বুক করা ছিল আগে থেকেই।

ওই লোকগুলো কোথায়?

লোকগুলো আজ সকালেই হোটেলের বিলটিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

আর্মাডা কার থানায় নিয়ে গেছ?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। হোটেল ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাও। আর বলে দাও, অ্যাডভান্স বুক করে যারা হোটেলে এসেছিল, সবটা যেন ডিটেলে জেনে আসেন তাদের সম্পর্কে।

আচ্ছা।

এতক্ষণ বদ্রী গোঁজ হয়ে বসেছিল। শঙ্কর চলে যাবার পর বলল, এই হোটেলে ঢুকে অবধি আমার মনে হচ্ছিল, এখানেই রহস্য জমে আছে।

প্রবীর ঘোষ বললেন, বদ্রীনারায়ণ এ-ব্যাপারে কি ভাবছ, একটু শুনি।

এখনো কিছু ভাবিনি আমি। আপনাদের কথাবার্তা শুনছি। তবে এই হোটেলের ভাবগতিক কেমন যেন।

এবার তিনজনই চুপচাপ হয়ে গেল। বদ্রীর ভাবনা বহুদূরে চলে যাচ্ছিল। কেদার ভাবছিলেন, একটা সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। প্রবীরবাবু ভাবছিলেন, দু'দিনের পরিশ্রমের কোন ফল পেলাম না এখনো পর্যন্ত।

কলিং বেল বাজলো আবার। বদ্রীই দরজা খুলল।

শঙ্কর ঘরে ঢুকে বলল, স্যার, ম্যানেজারবাবু এসেছেন।

হোটেল ম্যানেজার ঘরে ঢোকামাত্রই শঙ্কর বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে করিডরে পায়চারি করতে লাগল।

ম্যানেজার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমার নাম সম্বিৎ সেন। বলুন তো, কি ব্যাপার?

আমাদের আপাতত কোয়্যারি করার দু'টো বিষয় আছে। একটা হল কাল সন্ধ্যায় সাদা আর্মাডায় ক'জন এসেছিল আর কত নম্বর রুমে উঠেছিল?

রেজিস্ট্রার বলল, তিন তলায় একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘরে ওরা উঠেছিল। মোট তিন জন।

এখন কি ও ঘরে কোন গেস্ট এসেছে?

না।

ওই ঘর আমরা একটু চেক করে দেখব। সম্বিৎবাবু, আপনি ওই ঘরটা খুলে

দেবার ব্যবস্থা করুন। আর একটা কথা।

বলুন।

আপনি একটু খোঁজ নেবেন, ওই ঘর যে আগে থেকে বুকিং হয়েছিল, কোনো পরিচিত লোকের মাধ্যমে কি না সেটা জানতে পারলে খুব ভাল হত।

আচ্ছা, আমি দেখছি।

স্টেশন প্লাটফর্মে অনেকক্ষণ মাথা গুঁজে বসেছিল সেই লোকটা, যে নিজেকে রাম নামে পরিচয় দিয়েছিল। ওর হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেছে। ওর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

এক অজানা আশঙ্কা ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন শুষে নিয়েছে। ও ফিস ফিস করে উচ্চারণ করছিলো, কি করে হয়! কি করে এটা হয়! অসম্ভব ব্যাপার!

স্টেশন প্লাটফর্মের লাউডস্পিকারে ঘোষণা করা হলো, হাওড়া যাবার ট্রেন আসছে তিন নম্বর প্লাটফর্মে।

রাম বাঁধানো সেই বসার জায়গা থেকে উঠে পড়ল। ওর হাত-পা চলতে চাইছে না। তবুও ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে টিকিট ঘরের কাউন্টার থেকে শক্তিগড়ের একটা টিকিট কাটলো।

খানিকক্ষণ বাদেই ট্রেন এলো। রাম ট্রেনের পেছনের দিকে একটা কামরায় উঠে পড়ল। খুব বেশি ভিড় ছিল না গাড়িতে। বসার জায়গাও পেয়ে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

চুপচাপ বসে রইল রাম।

তার কী-ই বা করার আছে? ভয়ঙ্কর সব চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিন্তাটা যতই ওর মাথায় চেপে বসছে, ততই ওর মুখচোখ রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

ট্রেন রেলপথের একটা বড় বাঁক ঘুরতে ঘুরতে হুইসিল দিচ্ছিলো—ভোঁ-ও-ও-ও-ও! হুইসিলের সেই শব্দ রামের মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যাচ্ছিল। মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই শব্দটা ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভয়!—একটা শিরশির করা ভয় ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছিল ক্রমশঃ। ট্রেন চলছিল।

ফ্রেন্ডস লজের তিনতলায় একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘরে এই মুহূর্তে হাজির কলকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা কেদার মজুমদার, তাঁর সহকারী বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি এবং সদর থানার সেকেন্ড অফিসার প্রবীর ঘোষ। ঘরটা খুলে দিয়ে ম্যানেজার সম্বিৎ সেন নিচে নেমে গেছেন। তাঁর একটা টেলিফোন এসেছে।

কেদার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছিলেন। প্রবীরবাবু বাথরুমের ছিটকিনি খুলে সেখানে ঢুকে পড়লেন। বাথরুমের ভেতর কিছুই নেই। শুধু একটা সাবান কেসের মধ্যে ব্যবহার করা মার্গো সাবান পড়ে আছে। প্রবীর ঘোষ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিছু পেলেন?

আমাদের স্নান করার জন্য ওদের ব্যবহার করা একটা সাবান রেখে গেছে।

শুনে কেদার হেসে বললেন, ভালই তো। বদ্রীনারায়ণ টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে দেখে দমাস্-দমাস্ শব্দে বন্ধ করে দিল। এই ঘরে দুটো স্টিল আলমারি আছে। কেদার তার একটা খুলে ফেললেন। ভেতরে রয়েছে চারটে বালিশ, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে, দুটো বিছানার চাদর। সবগুলো টেনে নামিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে দিলেন কেদার। বললেন, না! কাজের জিনিস কিচ্ছু নেই।

বদ্রী ততক্ষণে দ্বিতীয় আলমারিটা খুলে ফেলেছে। এটার মধ্যে একটা সিন্থেটিক নেটের মশারি আর দুটো বিছানার চাদর ছাড়া কিছুই নেই। লকারগুলো ফাঁকা।

প্রবীর ঘোষ জানালা দিয়ে বাইরের বারান্দাটা দেখছিলেন। দূরে তাকিয়ে বললেন, এই যে কেদারবাবু, দেখে যান! এই জানালা থেকে সোজাসুজি গুড্ডু সিং-এর বাড়ির সামনেটা দেখা যাচ্ছে।

কেদার জানালার দিকে এগিয়ে এলেন। আবার এই ঘরে কলিং বেল বাজলো। বদ্রীনারায়ণ খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দরজা খুলে দিল। দেখা গেল, সম্বিৎ সেনের সঙ্গে শঙ্কর হাজির।

শঙ্কর প্রবীরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার, আশ্চর্য ব্যাপার!

কী হলো আবার?

এই ঘরের পেছনে টানা বারান্দার ওইখানটায়ই তো আমি টুল নিয়ে বসে সারাক্ষণ সাদা আর্মাডাটা লক্ষ্য রাখছিলাম। ওই দেখুন! টুলটা এখনো আছে।—তর্জনি তুলে জানালার বাইরেটা দেখালো শঙ্কর।

হুঁ। সব মিলে ব্যাপারটা ক্রমশঃ গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। তা কেদারবাবু! কিছু পেলেন নাকি?—প্রশ্ন ছুঁড়লেন প্রবীর ঘোষ।

এখনো পর্যন্ত না।

ম্যানেজার সম্বিৎ সেন বললেন, আমাকে কি আর দরকার আছে?

না। খানিকবাদেই যাচ্ছি আপনার কাছে। শুধু একটা কথা বলে দিচ্ছি—এই একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘরটা যে আমরা সার্চ করলাম তা যেন কেউ না জানে। বললেন প্রবীর ঘোষ।

ঠিক আছে।—বলে সম্বিৎবাবু চলে গেলেন। এবারও শঙ্কর ঘরের বাইরে গিয়ে

করিডরে পায়চারি করতে লাগল।

এদিকে বদ্রী খাটের নিচেটা উঁকি মেরে দেখছিল। পোড়া সিগারেটের টুকরো, ছাই, দোমড়ানো,-মোচড়ানো গোটা তিনেক ঠোঙা, পোড়া দেশলাই কাঠি বের হলো সেখান থেকে। এর বেশি আর কিছু নয়। কেদার বললেন, কি সিগ্রেট?

উইলস ফিল্টার। ঠোঙাগুলোয় করে বোধহয় খাস্তা কিছু এনে খেয়েছিল। সিঙ্গাড়া, নিমকি এসবের গুঁড়ো ঠোঙার মধ্যে রয়েছে।

বদ্রীনারায়ণ এবার বিছানার তোষকটা হ্যাঁচকা টান মেরে আধাআধি উল্টে দিল। দেখা গেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বেশকিছু কাগজ। তিনজনই হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার ওপর।

পাওয়া গেল একটা চিঠি, রেল লাইনের নকশা, দুটো সেলুলার ফোনের নম্বর আর একটা টাকা-পয়সার হিসাব লেখা কাগজ।

কেদার বললেন, সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে আমাদের ঘরে চলে যাই। প্রবীরবাবু, তাড়াতাড়ি করুন।

কেন?

চলুন। পরে বলছি। বদ্রী এদিকে বিছানা-টিছানা পরিপাটি করে গুছিয়ে ফেলেছে।

ওরা একশো ছেচল্লিশ নম্বর থেকে দ্রুত বেরিয়ে দরজা লক্ করে দিলো। বাইরে তখনো শঙ্কর পায়চারি করছিলো। প্রবীরবাবু শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে?

না।

ওরা তিনতলা থেকে নেমে এলো দোতলায়। ঢুকে পড়লো ওদের ছিয়াত্তর নম্বর রুমে। শঙ্কর তখনো তিনতলার করিডরে পায়চারি করতে করতে সবদিক নজর রাখছিল।

তিন

ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের টেবিলে সমস্ত কাগজপত্র ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে প্রবীর ঘোষ, কেদার আর বদ্রীনারায়ণ।

বদ্রী চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।—'নাম্বার ওয়ান ; রাম, লক্ষ্মণ আর ভরত কাজ-কারবার শেষ হয়ে গেলে বন্ধু-হোটেল থেকে চলে যাবে। সামনে সাদা গাড়ি। গাড়ি নিয়ে বটগাছের নিচে। সেখানে চায়ের দোকানে যদু আর মধু। সবাই সাদা গাড়িতে ওঠো। সামনে পুবে দুর্গা। সেখান থেকে যে-যার পথে।'



ভরত দ্রুত ছুটলো ফ্রেন্ডস লজের দিকে

বদ্রীনারায়ণ চিঠিটা পড়ে প্রবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে পূবদিকে নিশ্চয়ই দুর্গাপুর?

ঠিকই বলেছো। কিন্তু কেন?

আসলে এই যে চিঠিটা পড়লাম, এর মধ্যে কোনো হেঁয়ালি বা সাঙ্কেতিক কথা নেই। সাদা-সাপ্টা কথাই আছে।

কী রকম?

বোঝাই যাচ্ছে, বন্ধু হোটেল মানে আমাদের এই ফ্রেন্ডস লজকেই বলা হয়েছে। সমস্ত কাজ হয়ে যাবার পর সাদা আর্মাডা চেপে ওদের দুর্গাপুর চলে যাবার কথা। কাছে কোথাও বটতলায় আরো দু'জনকে তুলে নেবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আলুন্দিয়ার মোড়েই বটতলা আছে। ওখান থেকেই দুর্গাপুরের বাস ছাড়ে।

ব্যস! আর কি। ভাবগতিক সুবিধের নয় দেখে ওরা সাদা আর্মাডা ফেলে দিয়ে বাসে করে দুর্গাপুর পৌঁছে যে যার মতো সট্‌কে পড়েছে।

বদ্রী, তোর রিডিং কি এক্কেবারে কারেক্ট?—বলে কেদার টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে চোখ বোলাতে শুরু করলেন।

হ্যাঁ। আমি যা বলছি, তার সেন্ট পার্সেন্টি কারেক্ট।—বদ্রী প্রায় গর্জন করে উঠলো। ওর নীল চোখের মণি দুটো এবার আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

চিঠির নিচে কারুর নাম আছে?

ইংরেজিতে লেখা এইচ এ এম এ ডি।

হমদ?

না হামাদ!

হামাদ! নামটা খুব পরিচিত লাগছে।—কেদার বললেন।

প্রবীর ঘোষ ম্যাপের নকশাটা টেবিলে পেতে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

কেদারবাবু, এখানটা লক্ষ্য করুন। বদ্রী, তুমিও দেখো। আমি গতকাল চষে বেড়িয়েছি বিস্ফোরণের জায়গাটা। এই রেল লাইনের ওপর চৌকো দাগ দেওয়া জায়গা থেকে দু'পাশের এন্ডে যে মোটা কালো দাগ দেওয়া, তার একদিকে লেখা সাড়ে তিন, একদিকে আড়াই।

তাতে কী বোঝা গেল?

চৌকো দাগটা যদি বিস্ফোরণের স্পট হয়, তবে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকের রেল স্টেশনের দূরত্ব সাড়ে তিন কিলোমিটার, আর উত্তর দিকের স্টেশনের দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার।

হুঁ, বুঝলাম।

ব্যাপারটা হলো, বাস্তবিকই বিস্ফোরণ স্পট থেকে দু'দিকের রেল স্টেশনের দূরত্ব এই ম্যাপের উল্লিখিত সংখ্যার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

একেবারে পুরোপুরি?

হ্যাঁ।

বলেন কি!

তাই তো বলছি।

আর একবার ম্যাপটা ধরে ধরে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

প্রবীর ঘোষ কেদার আর বদ্রীকে ম্যাপের প্রত্যেকটি লাইন, চিহ্নিত এলাকা এবং উল্লিখিত সংখ্যাগুলি বিশ্লেষণ করে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

তা'হলে এতক্ষণে এগোবার মতো সূত্র পাওয়া গেল।—বদ্রী বললো।

কেদার বললেন, প্রবীরবাবু, এই জন্যই আমি তিনতলার সাসপেক্টেড ঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে বলেছিলাম। আমরা যে কিছু কাগজপত্র পেয়েছি, তা এখনো পর্যন্ত এই তিনজনই জানলাম। এমনকি শঙ্করেরও অজানা রইল।

তা অবশ্য ঠিক।

এই সাদা কাগজগুলো মনে হচ্ছে বেশ দরকারি।—বদ্রী বলল।

এ তো সাদা কাগজ!

তাই তো বেশি সন্দেহজনক!—বদ্রীর নীল চোখের মণিতে বিদ্যুতের ঝলক।

কি রহস্য আছে আবার এর মধ্যে? বদ্রী, খুঁজেও বের করিস সব উদ্ভট উদ্ভট ব্যাপার-স্যাপার!

কেদার সস্নেহে পিঠ চাপড়ে দিলেন বদ্রীর।

বদ্রীনারায়ণ ক্রমশঃ গম্ভীর এবং আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বদ্রীর এই মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন কেদার। যখন বদ্রীর মস্তিষ্কের কোষে কোষে কোনো রহস্যের জটিল জট নিয়ে আলোড়ন চলতে থাকে, তখনই বদ্রী এরকম নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওর অবচেতন মন যেন ছুটে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের দিকে। ওর নীল চোখের মণি দুটো তখন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখন সেরকমই অবস্থা হচ্ছিল। তাই দেখে প্রবীরবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কেদার ইঙ্গিতে প্রবীরবাবুকে থামিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে বদ্রীনারায়ণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো জিজ্ঞেস করল, লাইটার আছে?

আমার কাছে গ্যাস লাইটার আছে।—বলেই প্রবীর ঘোষ তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে লাইটার বের করলেন।

বদ্রী বিড় বিড় করে বলছিল, একটা চিঠিতে যখন 'নাম্বার ওয়ান' বলে নির্দেশ

দেওয়া আছে, তবে 'নাম্বার টু' নির্দেশিকাও থাকবে। 'নাম্বার থ্রি'-ও থাকতে পারে।

তাই তো!—কেদার প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন। দেখি, চিঠিটা দেখি।—বলে ছোঁ মেরে টেবিল থেকে সেটা তুলে নিলেন।—হুঁ, শুরুতেই লেখা, 'নাম্বার ওয়ান ; রাম লক্ষ্মণ আর ভরত'—

বদ্রীনারায়ণের আবিষ্টভাব কেটে যাচ্ছিল। সে স্বাভাবিক হচ্ছিল।

প্রবীরবাবু, লাইটারটা জ্বালান তো।

প্রবীর ঘোষ লাইটার জ্বালিয়ে সোজা করে ধরলেন। বদ্রী সেই জ্বলন্ত লাইটারের ওপর প্রথমে একটা সাদা কাগজ ধরল। তিনজনই উত্তেজিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কাগজের ওপর অদৃশ্য কালির লেখাগুলো ফুটে উঠেছে। আলোর ওপর কাগজটা ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরলো বদ্রী। সমস্ত লেখা ও রেখাগুলি ফুটে ওঠার পর বদ্রীনারায়ণ কাগজটা পেতে দিল টেবিলের ওপর। তিনজনই দেখল, তাতে লেখা খুব কমই আছে। আছে কাগজটা জুড়ে একটা মুখের স্কেচ। স্কেচের ওপরে লেখা 'নাম্বার থ্রি'। স্কেচের ঠিক নিচে লেখা আছে 'টাইগার'।

তা'হলে?—বদ্রীর নীল চোখ আবার ঝলসে উঠলো।

তা'হলে কী?—কেদার আর প্রবীর ঘোষ—দু'জনের চোখেই জিজ্ঞাসা।

তাহলে আর একটা কাগজ বাকি থাকে। তাহলে 'নাম্বার টু'। প্রবীরবাবু, লাইটারটা ফের জ্বালান দেখি।

প্রবীর ঘোষ ফের লাইটার জ্বালালে। বদ্রী সর্বশেষ কাগজটি তার ওপর ধরল। এবং অবধারিতভাবেই সেই কাগজে ফুটে উঠতে লাগল কিছু বাক্য। বদ্রী যত্ন করে কাগজের সবদিক ঘুরিয়ে নিতে লাগল জ্বলন্ত লাইটারের ওপর। শুধু লেখা নয়, আরো কিছু আঁকিবুকিও দেখা গেল কাগজে।

কাগজের সমস্ত লেখাই ফুটে উঠেছে—এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর বদ্রী কাগজটা সরালো। লাইটারের আলোর ছটায় তিনজনেরই বিস্মিত চোখমুখে আলো ছায়ার খেলা ধরা পড়েছিল। প্রবীর ঘোষ লাইটার নিভিয়ে দিলেন।

প্রথম চিঠি, আর অদৃশ্য কালিতে লেখা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চিঠি—তিনটে চিঠি টেবিলের ওপর রেখে ওরা তিনজন গভীর বিশ্লেষণে ডুবে গেল। ওরা মাঝে মাঝেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। তিনজনের মধ্যে তর্কও লেগে যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর ওরা একটা সিদ্ধান্তে এল। 'নাম্বার টু', অর্থাৎ, সবশেষে যে চিঠিটার লেখা ওরা ফুটিয়ে তুলেছিল লাইটারের আলোয়, সেই চিঠি নিয়েই যেন ওরা বেশি চিন্তায় পড়েছে। এবার ওরা সেই চিঠি সামনে রেখে বসেছে। বদ্রী বলল, বুঝলে কেদারদা, অদৃশ্য কালিতে লেখা চিঠি দুটো পরস্পর রিলেটেড। 'নাম্বার ওয়ান' চিঠির কাজকর্ম শেষ। সেটায় কিছু ইনফরমেশন আমরা পেলাম বটে, তবে এই

মুহূর্তে আমাদের কাছে 'নাম্বার টু' আর 'নাম্বার থ্রি'—এই দু'টো চিঠির গুরুত্ব বেশি।

একেবারে কারেক্ট অ্যানালিসিস!—প্রবীর ঘোষ বললেন।

'নাম্বার টু' চিঠিটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।—কেদার চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

হ্যাঁ, চিঠির প্রত্যেকটি বাক্য ভাল করে ক্লিঞ্চ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে, তা দ্রুত ঠিক করতে হবে, শুধু তাই নয়, কাজটাও করতে হবে দ্রুত।

কেন?

মাস কিলিং করতে যাদের বিবেকের কোথাও একটু বাঁধে না, ফেলিওর হয়ে ওরা আরো হিংস্র হয়ে উঠবে। ফের যাতে ফেলিওর না হয়, সেভাবেই আটঘাট বেঁধে কাজে নামবে।

কেদার বললেন, এই চিঠিটা একটু ভাল করে দেখ বদ্রী। প্রবীরবাবুও দেখুন ভাল করে। প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

হ্যাঁ। একটা ম্যাপ আমরা পাচ্ছি এই কাগজে। ম্যাপের পাশে দেখুন পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ; দিক নির্দেশ করা আছে। দেখুন, উত্তর দিকের মাথা থেকে আসা মোটা লাইনটা পুবের লাইনের সঙ্গে মিলেছে দক্ষিণ ঘেঁষে।

এই চিহ্নটা পাহাড় আর পাশের এই চিহ্নগুলো জঙ্গলই বোঝাচ্ছে। তাই তো?

হ্যাঁ। দক্ষিণ ঘেঁষা এই পয়েন্টে এরা এসে মিলবে। ম্যাপের পাশাপাশি নিচের নোট ফলো করুন। এখানে কোন গেস্ট হাউস বা হোটেল আছে, যার নাম আরণ্যক।

কেদারদা, একটা জিনিস ভাল করে লক্ষ্য কর। উত্তর দিকের মাথা থেকে আসা লাইনটায় অ্যারো মার্ক করা আছে ওদের মিলবার পয়েন্টের দিকে। আবার পয়েন্ট থেকে অ্যারো মার্ক করা আছে পশ্চিমমুখী লাইন ধরে।

তা'হলে সাধারণভাবে অনুমান করে নেওয়া যায়, কেউ বা কয়েকজন উত্তর দিক থেকে এসে এই পয়েন্টে কারোর সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে এই রাস্তা ধরে পশ্চিমদিকে চলে যাবে।

এবং এই পয়েন্টে 'আরণ্যক' নামে একটা গেস্ট হাউস বা হোটেল আছে।

নিচে দ্বিতীয় প্যারার লেখাগুলো খুবই ইমপরট্যান্ট। যার সঙ্গে 'নাম্বার থ্রি' চিঠিটার রিলেশন আছে।

হ্যাঁ। জায়গাটা পড় তো বদ্রী!

এখানে টাইগার নামের লোকটার চেহারার বর্ণনা দেওয়া আছে। বোঝা যাচ্ছে, টাইগারকে এরা সরাসরি দেখেনি। লেখা আছে, দার্জিলিং মেলে টাইগার শিয়ালদা নামবে দশ-আট তারিখে, অর্থাৎ দশই আগস্ট।

তার মানে হাতে আর চার দিন।

হ্যাঁ। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, প্রত্যেকটাই যে ছদ্মনাম, এটা ধরেই নেওয়া যায়। এর মধ্যে রামকেই বলা হচ্ছে, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে টাইগারকে ফলো করতে। দেখা করতে বারণ করা হয়েছে। টাইগার নিজে নিজেই অশোক হোটেলে যাবে। সব দিক নিশ্চিন্ত হয়ে রাত সাড়ে দশটায় হোটেল অশোকে গিয়ে টাইগারের সঙ্গে কথা বলতে হবে রামকে। সেখানে প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে রামকে সেই হোটেলেরই অন্য কোনো রুমে রাতে থাকতে বলা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কথাগুলো কি, সেটা আমাদের জানা দরকার। আরণ্যক হোটেল পাহাড় ও জঙ্গলঘেরা কোন্ জায়গায় আছে, সেটা জানতে হবে। আর জানা দরকার, টাইগারের কাজ কি, সে কি করে?

কলিং বেল বাজলো। বদ্রী তাড়াতাড়ি করে কাগজপত্র গুটিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল। প্রবীর ঘোষই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। শঙ্কর ঘরে ঢুকল।—স্যার, ম্যানেজার সম্বিৎবাবু জানতে চাইছিলেন, ওনাকে আর দরকার আছে কি না।

না, দরকার নেই।—বদ্রী ঝট করে বলল।

শঙ্কর চলে যাচ্ছিল। প্রবীরবাবু ডেকে বললেন, শঙ্কর, তুমি রাতে এখানেই থেকো। সবদিক নজরে রেখো। এখানেই রাতের খাওয়া সেরে নিও।

শঙ্কর চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরে প্রবীরবাবুও ফ্রেন্ডস লজ থেকে বেরিয়ে জিপ নিয়ে থানায় চলে গেলেন।

ট্রেন শক্তিগড় প্লাটফর্মে থামতে না থামতেই রাম লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। বেশ জোরে হেঁটে চলে এলো প্লাটফর্মের বাইরে। গেটে কেউ টিকিটও চাইল না। নিচে নেমে রিকশা স্ট্যান্ড থেকে একটা রিকশায় উঠে বলল, চলো বাজারের দিকে।

বাজারের একটু আগেই রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ও উল্টোপথে হাঁটতে লাগল। অনেকটাই পেছন দিকে হেঁটে এল রাম। মাঝেমাঝেই হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল সে। একটা চাপা উত্তেজনা আর আতঙ্ক দুটোই ওর মধ্যে কাজ করছিল। তবুও কাজগুলো করতে হবে, তাই করছি—এমন অনিচ্ছাকৃত এক মনোভাব রামের মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে চলাচল করছিল। আর একবার হাতঘড়ির দিকে চোখ রাখলো রাম। নিজের হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

ক্রিং-ক্রিং করে পেছন থেকে সাইকেলের বেলের শব্দ। হিসেবমতো ঠিকই আছে। রামকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেইমতো সে বেল শুনেও পেছনে তাকাল না। সাইকেল আরোহী তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, সামনে ডানদিকে হলুদ রঙের বাড়িটায় ঢুকে কলিং বেল বাজাও!

সাইকেল আরোহী সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। রাম দেখল, সামনেই রাস্তার ডানদিকে হলুদ রঙের একতলা পাকা বাড়ি। কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তা থেকে ডানদিকে নেমে পড়ল সে। হলুদ বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপল।

একবার, দুবার, তিনবার। সাড়া নেই কোনো। রাম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিস্তব্ধ, নিরুত্তাপ পরিবেশ। রাম আর বেল টিপল না। সে দাঁড়িয়ে থেকে হাতঘড়িতে সময় দেখতে লাগল।

রামকে হতচকিত করে দিয়ে এবার হঠাৎই দরজা খুলে গেল হাট করে। তাগড়াই চেহারার চাপদাড়িওয়ালা একটা লোক। রামকে বলল, জলদি ভেতরে এসো।

চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে রাম পেছনে তাকিয়ে রাস্তায় সেই সাইকেল আরোহীকে দেখতে পেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। আর একজন লোকও সেই। চাপদাড়িওয়ালা লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে রাম বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটাতে হাজির হল। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ। একটা একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। ঘরে শুধুমাত্র একটা চৌকি রয়েছে। লোকটা রামকে বলল, ওখানেই বোস।—রাম বসল।

ঘটনা শুনেছ? কাজটা হয়নি।

হ্যাঁ। কাগজে দেখলাম।

একটা প্ল্যানে কত টাকা খরচ হয় জান? প্ল্যান ভেস্তে গেলে পুরো দলটাকেই ভেঙে দিতে হয়। না হলে পুলিস ওই সূত্রগুলো ধরে এগোতে থাকবে।

কিন্তু আমাদের কোন ভুল ছিল না। অন্য কোন গণ্ডগোল হয়েছে।

সেটা আমরা খোঁজ লাগাচ্ছি। তোমাদের কোনো ফল্ট থাকলে পার পাবে না। অ্যাডভান্স পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে তোমাদের। যাক গে! পেছনে তাকাবার সময় নেই এখন। তোমার লোকগুলোকে বিদেয় করে দিয়েছো?

হ্যাঁ। টাকা-পয়সা শোধ-বোধ হয়ে গেছে।

বহুৎ আচ্ছা। ওই চ্যাপ্টার এখন এক্কেবারে ক্লোজড্।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা শেষ। কেউ কারোর খোঁজ পাবে না।

ভালো কথা। নির্দেশগুলো দেখে নিয়েছ?

কোন নির্দেশ?

তিনটে কাগজ দেওয়া হয়েছিল তোমাকে। সেগুলো দেখোনি?

দেখেছি।—তাড়াতাড়ি করে কথাটা বলে দিল রাম। কিন্তু ওর বুকটা ধক্ করে উঠলো। কাগজগুলো তো সে দেখেনি! মস্তো বড় ভুল করে ফেলেছে। বাঁচার আর

কোনো আশা নেই! ফ্রেন্ডস লজের একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘর থেকে ওরা তিনজন বেরোবার মুখে হোটেল বয় চা দিতে এসেছিল। ওরা তাড়াতাড়ি করে কাগজপত্রগুলো বেডের নিচে লুকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বেরোবার সময় ভুলে গিয়েছিল সে কথা। দাঁত-মুখ চেপে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে হচ্ছিল রামকে। সাঙঘাতিক ভুল। সেটা জানতে পারলে খুন করে ফেলবে ওরা। রামের কপালে বিন-বিন করে ঘাম ফুটে উঠছিল।

কী হলো?

শরীরটা খারাপ লাগছে।

ঠিক আছে। আর কোনো কথা নেই। এখানে ঘণ্টা চারেক থেকে রেস্ট নেবার সময় আছে। আজ রাতের মধ্যে কলকাতা চলে যাবে। তারপর টাইগারকে নিয়ে তোমার কাজ। শুধু এটুকু বলে দিচ্ছি, টাইগার সত্যিই টাইগার। এক্সপ্লোশন এক্সপার্ট। একেবারে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের। তোমরা মিস করলেও সে মিস করবে না। যাও, ভেতরের ঘরে রেস্ট নিয়ে নাও।

না। রেস্ট নেব না। আমার প্ল্যানিং করা আছে। আমি এক্ষুণি বেরবো।

ও কে। বেরিয়ে পড়তে পারো। তোমার যেমন খুশি!

চাপদাড়িওয়ালা লোকটা কুতকুতে চোখ দিয়ে রামকে দেখছিল। রামের দ্রুততাতে ও খানিকটা খুশি। তবে অবাকও হয়েছে কিছুটা। এই নিয়ে রামের সাথে তার চারবার দেখা। কিন্তু এবারই সে লক্ষ্য করলো, রাম বেশ অন্যমনস্ক। তবে সমস্ত কথার ঠিকঠাক জবাব দিয়েছে। একটু তড়িঘড়িও করছে।

আসলে রাম এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচে। ওর মনে চিন্তার ঢেউ খেলে যাচ্ছে একের পর এক। নতুন করে ভাবতে হবে একা একা। কাউকে কিছু বলা যাবে না। যে ভুল সে করেছে, তার জন্য ওর মৃত্যু বরাদ্দ হয়ে আছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সে হলুদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের রিক্‌শা স্ট্যান্ডে চলে এলো। একটা রিকশা ধরে সোজা রেল স্টেশন। ও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে কি করবে এবার। আজ কলকাতা পৌঁছনো যাবে না। যে করেই হোক, কাগজগুলো উদ্ধার করে কাল দুপুরের মধ্যে কলকাতা পৌঁছতে হবে। আর তা যদি না হয়?—তা হলে সব অন্ধকার। কিছু করার নেই আর।

গভীর রাত থেকে সময় এবার আরো একটা দিনের দিকে এগোচ্ছিলো। কেদার-বদ্রী দুজনেই হোটেলের ঘরে ঘুমে অচেতন। শঙ্কর রাত একটা পর্যন্ত বাইরে ছিল। এবার ঘরে ঢুকে ঘুমে ঢলে পড়েছে। রাতচরা একটা পাখি ডানা ঝটপট করতে করতে হোটেলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশে একটা নারকেল গাছের

মাথায় বসল।

ছোটখাট এই সদর শহর রাত দু'টোর সময় নৈঃশব্দ্যের মোড়কে ঢেকে ঘুমের জগতে পাঠিয়ে দিয়েছে শহরবাসীদের। তবুও নিশীথ রাতের একান্ত কিছু শব্দ থাকে। মায়া থাকে, থাকে কুহেলী। কেউ স্বপ্নে দুঃস্বপ্ন দেখে। কেউ সত্যি সত্যি দুঃস্বপ্নের শিকার হয়। হোটেলের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকেও বদ্রীর অবচেতন মন অস্পষ্ট এক নিশানায় সতর্ক সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল। বদ্রীনারায়ণের মনের জগৎ ভারী অদ্ভুত। কোনো সমস্যা বা কোনো রহস্যের মুখোমুখি হলে তার অবচেতন মনের সমস্ত দরজাগুলো একে একে খুলে যায়। তা স্বপ্নে-জাগরণে যখনই হোক না কেন। সন্ধেবেলা ওই সব চিঠি আর ম্যাপ দেখা ও আলোচনার পর সেই বিষয়গুলোই এখন ওর অবচেতন মনে কাজ করে চলেছে। ঘুমের মধ্যেও শিহরণ হচ্ছিল ওর সারা শরীরে। মনের মধ্যেও আর একটা মন ওকে সাবধান করে দিচ্ছিল। সতর্কতার বার্তা পাঠাচ্ছিল আর একটা মনের কাছে।

দু'চারটে লক্ষ্মীপ্যাঁচা ফ্রেন্ডস লজের কাছাকাছি এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদ থেকে বড় বড় গাছগুলোয় গিয়ে বসেছে। আবার চলে আসছে বাড়িগুলোর ছাদে, কার্নিসে। চাঁদ দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে খানিকটা ঝুলে আছে। ভেপার ল্যাম্পের হলুদ আলো ভেসে যাচ্ছে শহরের বড় বড় সড়কগুলোর ওপর দিয়ে।

ঘড়ির কাঁটা শেষ রাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। নিস্তব্ধ রাতে মনে হয়, সময় যেন স্থির হয়ে আছে। কিন্তু সময় তো এগিয়েই চলেছে।

বাত তিনটে দশ। সদর শহরের মাইলখানেক দূর দিয়ে চলে গেছে হাইওয়ে। সেখান দিয়ে ভারী ভারী ট্রাকগুলো চলে যাচ্ছে মাটি কাঁপিয়ে। হাইওয়ে থেকে সদরে যাবার কানেকটারের মুখে একটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ট্রাকের চালকের কেবিন থেকে সেই অন্ধকার পথে লাফ দিয়ে নামলো একজন।

হেডলাইটের জ্বলন্ত দুই চোখ নিয়ে আবার গর্জন করে উঠল ট্রাকটা। নিমেষের মধ্যে ছুটে চলে গেলো সেটা। কানেক্টর ধরে সেই অন্ধকারে লোকটা হাঁটতে শুরু করলো শহরের দিকে। খুব জোরে হাঁটতে লাগল সে।

ঘুমের মধ্যেও বদ্রীর অস্বস্তি হচ্ছিল। স্বপ্নের পর্দায় ভেসে উঠছিল নানা রকম ছায়াছায়া মানুষের ছবি। ওর ঘুমের গাঢ়ত্ব নষ্ট হয়ে গেল। ও তন্দ্রাঘোরে বিছানায় পড়ে রইল। বাইরে রাতচরা পাখির ডানা ঝটপটানির শব্দ বদ্রীর কানে গিয়ে পৌঁছলো। নানারকম তালগোল চলছিল ঘুমন্ত বদ্রীর মস্তিষ্কে। এবার বদ্রীর ঘুম ভেঙে গেল।

বদ্রী পাশ ফিরে দেখল, কেদার ঘুমোচ্ছেন। বদ্রী চুপ করেই রইলো। ওর

অবচেতন মন ওকে জানান দিচ্ছিল, একটা পদশব্দ। হ্যাঁ, কে যেন বহু দূর থেকে হেঁটে আসছে!

ফ্রেন্ডস লজ আবাসিক হোটেলে এসে অবধি বদ্রীর বারবার মনে হয়েছে, এই কথা ; এখানে এই থমথমে নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর কোন কিছুর ইঙ্গিত। যেমন এখন ওর মন বলছে, সতর্ক থাকা দরকার। কিছু ঘটতে পারে। যখন বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়, সেই সময় বদ্রীনারায়ণের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সতেজ হয়ে ছুটতে থাকে। তখন তাকে দেখলে মনে হয়, সে যেন কোন ভিন গ্রহ থেকে আসা মানুষ। তার নীল চোখের মণি দুটো তখন রক্তাভ হয়ে ঘুর্ণির মতো ঘুরতে থাকে।

এই মুহূর্তে বদ্রীর চোখ-মুখের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সেই অস্বাভাবিক ভিনগ্রহের মানুষের চেহারা পেয়ে যাচ্ছিল। বদ্রী শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল। তারপর বিছানার ওপরই চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে রইল বহুক্ষণ। নিজের মনকে সংহত করে শান্তভাব এনে চিন্তার তরঙ্গ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো মস্তিষ্কের কোষে কোষে। ওর চিন্তার জগৎ ক্রমশঃ এই রহস্যের জটিল ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো। বদ্রীনারায়ণ যেন এবার তার কাজের নির্দিষ্ট দিশা পেয়ে যাচ্ছিল। সে উপলব্ধি করতে পারছিল, এই মুহূর্ত থেকেই তাদের চোখ-কান খোলা রেখে সতর্কতার চূড়ান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে।

শরীর টানটান করে বহুক্ষণ পদ্মাসনে বসে, নিজের মনকে সংযত ও সংহত করে, বদ্রীনারায়ণ তার চিন্তার দরজা খুলে দিল। বিগত ঘটনা, খুঁজে পাওয়া সূত্র আর আগামী কাজগুলোর একটা রূপরেখা করে ফেললো মনে মনে। এবার পদ্মাসন থেকে উঠে ঘুমন্ত কেদারকে ঠেলা দিয়ে ডাকলো, ও কেদারদা! কেদারদা! উঠে পড়ো।

তখনই ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা মিষ্টি আওয়াজ তুলে জানান দিল, এখন ঠিক রাত সাড়ে তিনটে বাজে।

হাইওয়ের মুখে রাতের অন্ধকারে যে লোকটা ট্রাক থেকে নেমেছিলো, হাঁটতে হাঁটতে সে এখন শহরে পৌঁছে গেছে। শহর অন্ধকার নয়। স্ট্রিট লাইটের আলোয় ঝলমল করছে। অন্ধকারের সেই ছায়ামূর্তি এখন ঝলমলে আলোয় দৃশ্যমান। সে আর কেউ নয়। সে হলো রাম। হাইওয়ে থেকে শহরে ঢোকা অবধি সে যেই দ্রুততায় হাঁটছিলো, এখন তা কমিয়ে দিলো। স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হাঁটতে হাঁটতে সে আলুন্দিয়ার মোড়ে চলে এলো। রামের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পথশ্রমের ক্লান্তি। সন্ধেবেলা শক্তিগড় থেকে বেরিয়ে ট্রেন, বাস, ট্রাক, যখন যেমন পেয়েছে, তাই করে ভোর রাতে এখানে এসে পৌঁছলো। এখনই তার আসল কাজ। কি করবে এখন সে?

আলুন্দিয়ার মোড় পেরিয়ে ফ্রেন্ডস লজের দিকেই হাঁটতে লাগলো রাম। মনে মনে অঙ্ক কষছিল সে, কীভাবে হোটেলে যাবে? সে একটা সিদ্ধান্তে এলো। হাতঘড়িতে দেখলো ভোর পৌনে চারটে। প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা-পয়সা দেখে নিশ্চিন্ত হল।

ঢিমে তালেই হাঁটতে লাগল রাম। যতটা সম্ভব দেরি করে হোটেলে পৌঁছানো যায়। এরই মধ্যে শহরের রাস্তার দু'-একটা চায়ের দোকানে ঝাঁপ খোলা শুরু হয়েছে। একটা দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি দাদা, চা হবে নাকি?

• পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে। জল ফুটলেই চা দেব।

রাম সেই দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। মনে মনে ভাবল, একটা দোকানে বসে থাকা ভাল। রাস্তায় কোনো টহলদারী পুলিসের নজরে এলে ফালতু সন্দেহের মধ্যে পড়ব।

মিনিট কুড়ির মধ্যে চা-বিস্কুট খেয়ে রাম যখন উঠল তখন বেশ আলো। ঘড়িতে দেখল চারটে পঁচিশ। মনে মনে ও যা ভেবে নিয়েছিল, সেই অনুযায়ী সোজা ফ্রেন্ডস লজের দিকেই চলল।

রাস্তায় একটা দুটো রিকশা চলতে শুরু করেছে। পৌরসভার একটা জলের গাড়ি চলে গেল। ফেরিওয়ালারা জিনিসপত্রের ডালা মাথায় নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছে। এ-সব দেখতে দেখতে রাম ফ্রেন্ডস লজে পৌঁছে গেল।

চার

ফ্রেন্ডস লজের এখনও ঘুমঘোর কাটেনি। নিচে কাউন্টারে চেয়ারে বসে একজন ঝিমোচ্ছিল। রাম সোজা কাউন্টাবে গিয়ে বলল, ঘর পাওয়া যাবে?

কাউন্টারের লোকটা একটু থতমত খেয়ে সোজা হয়ে বসল।

কী বলছেন?

বলছি, সিঙ্গল বেডের ঘর খালি আছে? রাত জেগে ট্রেনে আসতে আসতে ভারী টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি। নিরিবিলিতে তিনতলায় পেলে ভাল হয়।

হয়ে যাবে।

একদিনের জন্য পুরো পেমেন্ট করে দিচ্ছি।

কাউন্টারের লোকটা রেজিস্ট্রার খাতা বের করে, পাতা উল্টে দেখে বলল, তিনতলার শেষ মাথায় একশো সাঁইতিরিশ নম্বর সিঙ্গল বেডের ঘরটা দিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ।—বলে রাম মানিব্যাগ বের করে টাকা মিটিয়ে দিল। কাউন্টারে রাত থেকে ভোর অবধি যে লোকটা আজ বসেছে, বোঝা যাচ্ছে, সে রামকে চিনতে



গতকাল চষে বেড়িয়েছি বিস্ফোরণের জায়গা

পারেনি। বোধহয় আগের দিন রামকে সে দেখেনি। টাকা নিয়ে খুচরো টাকা রামকে ফেরৎ দিয়ে সে একজন বেয়ারাকে ডেকে বলল, হরিশ, একশো সাঁইতিরিশ নম্বর ঘরটা এই ভদ্রলোককে খুলে দাও।

রাম আগে আগেই যাচ্ছিল। পেছন পেছন চলল হরিশ। তিনতলায় উঠে হরিশ এগিয়ে গেল। রাম হরিশের পেছনে। হরিশ দরজায় চাবি ঢুকিয়ে ঘর খুলে ভেতরে গিয়ে ফটাফট সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

রাম এবার ঘরে ঢুকল। হরিশ বলল, এই যে, চাবি রইল। বয়কে চা-বিস্কুট দিয়ে যেতে বলব?

না। আমি বড্ড টায়ার্ড। চান-ফান করে একটু রেস্ট নেব। ঘণ্টা দেড়েক বাদে নিচে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসব।

এবার মুখোমুখি হওয়াতে হরিশ অবাক। আপনারা তিন জন কালকে একশো ছেচল্লিশে ছিলেন না?

ঠিকই ধরেছ। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ তো! দুর্গাপুরে কাজ সেরে ভোরে ব্যাক করলাম। ঠিক আছে ভাই। একটু রেস্ট নিয়ে নিচে যাচ্ছি।

একটু বিস্মিত হরিশ ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে চলে গেল। রাম চট করে দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে রইল। সারা রাতের অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা ওকে ক্লান্তিতে ডুবিয়ে দিতে চাইছিল। মিনিট দুয়েক সে ওভাবেই পড়ে রইল। কিন্তু একরাশ ভয় ওকে তাড়া করছিল । ও উঠে পড়ল। মনে মনে বলল, যা করবার এক্ষুণি করতে হবে। এবার ও টেবিলের ওপরে রাখা চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে বসল, খুলে ফেলল ব্যাগের চেন। ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করল পেতলের তৈরি কিছু যন্ত্রপাতি। স্ক্রু ড্রাইভার, রেঞ্জ, এমনকি লোহার পেরেকও রয়েছে তাতে।

রেঞ্জ স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে পেতলের সেই জিনিসপত্রগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই জোড়া লাগিয়ে ফেলল সে। কি মনে হওয়াতে হঠাৎ করে বাথরুম খুলে শাওয়ার চালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো ফের। বাথরুমের দরজা আলতো ভেজিয়ে দিয়ে আবার সে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে বসলো। বাথরুমের ভেতর থেকে শাওয়ারের জল পড়ার শব্দ ভেসে আসছিল।

এবার ঘরের দরজা খুলে ফেলল রাম। বাইরে এসে দাঁড়াল। করিডর ফাঁকা। আর একটু এগিয়ে একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘর। খানিকটা এগিয়ে গেল সে। সিঁড়ির দিকে খসখস শব্দ শুনে ঝট করে পেছন দিকে তাকাল। না! কেউ নেই। রাম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য ছিল তখনও। একটু থেমে সে বড় বড় পা ফেলে একশো ছেচল্লিশ নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সতর্ক

চোখে ডান-বাঁ আর পেছন দিক দেখে নিল। এবার ঝট করে হাতের যন্ত্রটা দরজার লকে ঠেকিয়ে খানিকটা চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। লকের ভেতর কট্-কট্ করে শব্দ হল। বোঝা গেল, লকের কলকব্জা ভাঙলো। যন্ত্রটা সরিয়ে নিয়ে হ্যান্ডেলে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। নিমেষের মধ্যে ঘরে ঢুকে গেল রাম। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। ছুটে গিয়ে বিছানার তোষক উল্টে ফেলল। না! কোন কাগজপত্র নেই।—বেডে রাখিনি তো তাড়াহুড়ো করে? মনে মনে এই কথা আউড়ে সে দ্বিতীয় বিছানাটাও হাঁটকাতে লাগল। না! কোনো কাগজপত্র নেই! কোথায় গেল? গেল কোথায় কাগজপত্রগুলো? তবে কি হোটেলের লোকজন ঘর পরিষ্কার করতে এসে সব ফেলে দিয়েছে!

এখন কি করবো আমি? সর্বনাশের ব্যাপার! ওরা আমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে।—অস্ফুটে উচ্চারণ করল রাম। মনে মনে ঠিক করলো, এক্ষুণি পালাবে এখান থেকে।

ছিটকিনি খুলে একশো ছেচল্লিশের দরজা ভেজিয়ে করিডর দিয়ে দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে ও চলে এলো একশো সাঁইতিরিশ নম্বর ঘরের সামনে। হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়লো ঘরে। বাথরুমে শাওয়ার থেকে জল পড়ার শব্দ হয়েই যাচ্ছিল। ও বাথরুমের দিকে এগোল।—হঠাৎই হুঙ্কার—

বাছাধন! এবার যাবে কোথা!—বলেই কে একজন রামের গলা পেঁচিয়ে ধরলো বজ্র আঁটুনিতে। ডান হাত তুলে তৎক্ষণাৎ পেছন দিকে চালিয়েছিল রাম। পেছনের লোকটার ঘাড়ে লেগেওছিল। কিন্তু সাঁড়াশির মতো দুটো হাত যেভাবে গলায় চেপে বসেছিল, তাতেই ওর দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা।

ডান পায়ের গোঁড়ালিতে গোঁত্তা খেয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল রাম। পা দুটো শিথিল হয়ে গেল। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল।

বদ্রী, এ-ব্যাটার হাত দুটো আগে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল।—কেদারের গলা পাওয়া গেল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দ্রুততার সঙ্গে কেদার আর বদ্রী রামের হাত পা-মুখ বেঁধে ফেলল। দরজা ভেতর থেকে লক্ করে ঘরের সব আলো জ্বেলে দিল। মেঝের মধ্যে পড়ে রইল রাম। সারা ঘর একবার ভাল করে তল্লাশি করে কেদার বললেন, বদ্রী, নিচে গিয়ে থানায় ফোন কর। প্রবীরবাবুকে জিপ নিয়ে আসতে বলবি। শুধু বলবি, একজনকে পাকড়েছি।

বদ্রী দরজার লক্ খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কেদার ফের ডাকলেন। বললেন, এক্ষুণি আসতে বলবি। এখনো সকাল। লোক জানাজানির আগেই এ ব্যাটাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে।

হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় রাম মেঝেতে পড়েছিল বটে, তবে ওর মন থেকে সমস্ত আতঙ্ক আর ভয় কেটে গিয়েছিল। একটু আগেও ভাবছিল রাম, ওদের গ্যাঙের হাত থেকে কোথায় পালাবে? যে ভুল সে করেছে, তাতে ওরা ওকে মেরে ফেলতোই। তবুও পুলিসের হাতে পড়ে রাম বেঁচে গেল। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে জেলের কুঠুরিতে থাকা ভাল। শেষ পর্যন্ত শাপে বর হল রামের।

সতেরো মিনিটের মাথায় জিপ নিয়ে প্রবীরবাবু হোটেলে চলে এলেন। সবকিছুই ঝটপট করে করতে হল। তিন তলায় একশো সাঁইত্রিশ নম্বর ঘরে গিয়ে রামের মুখ আর পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে জিপে তোলা হল।

জিপ ছুটলো থানায়। একটা বিশেষ ঘরে রাখা হল রামকে। চলল ম্যারাথন জেরা। জেরার সময় বদ্রী না থাকলেও কেদার হাজির ছিলেন। ঘণ্টা দেড়েক জেরা চলল! জেরার পর দেখা গেল কেদার এবং প্রবীরবাবুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জেরা শেষে কেদার, প্রবীরবাবু আর বদ্রীর মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। প্রবীরবাবুর ঘরে তখনও বসে কেদার আর বদ্রী। প্রবীরবাবু টেলিফোনে ডায়াল করলেন।

হ্যালো, স্ট্যান্ডার্ড ট্রাভেলস?

হ্যাঁ, বলুন!

সদর থানা থেকে সেকেন্ড অফিসার প্রবীর ঘোষ বলছি। একটা প্রাইভেট কার আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য চাই।

হয়ে যাবে স্যার। কখন চাই?

এক্ষুণি লাগবে। আমরা এগারোটা নাগাদ বেরবো। কলকাতা যেতে হবে। ভালো ড্রাইভার দেবে। শক্তপোক্ত।

ঠিক আছে স্যার।

ভালো গাড়ি দেবে। সবদিক চেক করে দেবে। রাস্তায় যেন বিগড়ে না যায়। এমার্জেন্সি কাজ নিয়ে বেরোচ্ছি। মাঝখানে খারাপ হলে বুঝতেই পারছো—

না না স্যার। একেবারে আনকোরা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক দশটা পঞ্চাশ মিনিটে কেদার, প্রবীর ঘোষ এবং বদ্রী স্ট্যান্ডার্ড ট্রাভেলসের একটা ছাই রঙের প্রাইভেটে করে কলকাতার পথে রওনা দিল। গাড়ির নম্বর জিরো জিরো ফোর, এইট নাইন ফোর জিরো।

দুপুর দুটো দশ মিনিটে বাগবাজারে উদিতভানু ইনফরমেশনের সামনে তিনজনকে নিয়ে হাজির হলো ছাইরঙের অ্যামবাসাডার গাড়িটা। ওরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কেদার ভেতরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন, প্রবীরবাবু, এই হচ্ছে কেদার-বদ্রীর যতরকম কেরামতির পীঠস্থান। দু'বেলা এখানে বসেই আমরা নিজেদের মস্তিষ্ক শান দিয়ে নিই।

কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রবীরবাবু।

কেদার চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাকলেন দিলানন্দ! ও দিলানন্দ!

দিলানন্দ যেন ওঁৎ পেতেই ছিল। নিমেষে কেদারের সামনে এসে হাজির।

কিদারবাবু, বুলাইছেন?

হ্যাঁ, বুলাইছি তো বটেই! কিন্তু আমাদের চারজনের খাবারটাবার কিছু জুটবে?

আদমী তো তিন আসে। চৌঠা তো নেহী!

আরে, যে গাড়িতে করে এলাম, তার ড্রাইভার কি শুধু বাগবাজারের হাওয়া খাবে!

হাঁ, হাঁ। ওহি সাচ বাতই আসে। ডিরাইভার হাওয়া ভি খাবে।

হাওয়া খাবে মানে?

বাত যো আসে, সেটা হল,—

কোনো বাত ফাতের দরকার নেই। চারজনের মতো খাবার আছে?

নায়, নেহি আছে।

ব্যস। তোমার সোজা বক্তব্য বলতে শরম লাগছিলো। তাই তো!

জি। থোরা শরম—

ঠিক আছে। দৌড়ে যাও। কমলা হোটেল থেকে চারটে মিল নিয়ে এসো। মাংস-ভাত, আলুভাজা। আর কিচ্ছু নয়। দৌড়ে যাও। পেটের যা অবস্থা, গোয়েন্দাগিরি করা লাটে উঠবে এবার।

কেদারের কথাবার্তার ঢঙ দেখে প্রবীরবাবু অট্টহাস্য করে উঠলেন। মিটিমিটি হাসছিল বদ্রীনারায়ণ।

এদিকে কেদার ঝটাপট টেলিফোন তুললেন। ডায়াল করলেন। ওপাশে রিং হচ্ছিল।

হ্যালো! শ্যামল বলছো? আমি কেদারদা। বাড়িতে আছো ভাগ্যিস! খুব দরকার। দশ মিনিটের মধ্যে চলে এসো। না, না! ফোনে কোনো কথা নয়। জরুরি দরকার। তোমার মালপত্র ঝোলা নিয়ে এক্ষুণি এসো!

কেদার টেলিফোন রেখে প্রবীর ঘোষকে বললেন, শ্যামল জানা আর্টিস্ট। ছবি আঁকে। ওকে দিয়ে টাইগারের মুখের স্কেচটা সামনে রেখে ছবি আঁকাতে চাইছি।

দিলানন্দ সিং হোটেল থেকে ভাত নিয়ে আসার চল্লিশ সেকেন্ড পরেই শিল্পী শ্যামল উদিতভানু ইনফরমেশনে হাজির।

একদিকে খাবার টেবিলে ওরা খেতে বসল। আর অন্যদিকে শ্যামল উদিতভানুর অফিসঘরের টেবিলে বসে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলতে লাগল অচেনা টাইগারের পূর্ণ মুখাবয়ব।

খাওয়া-দাওয়ার পর এমনকি ওরা বেশ খানিকক্ষণ গড়িয়েও নিল। কেদার তো ঘুমিয়েই পড়েছিলেন।

বিকেলবেলা তিনজনের দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হল। সাড়ে চারটে নাগাদ উদিতভানু থেকে বেরিয়ে ওরা পাঁচটার সময় শিয়ালদহ এল। গাড়ি বউবাজার থানার কম্পাউন্ডে রেখে ওরা থানার ভেতরে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিল। ওসি-র সঙ্গে দেখা করে বলল, স্যার, শিয়ালদা স্টেশনের এনকোয়্যারিতে টেলিফোন করে একটু জেনে নেবেন, ডাউন দার্জিলিং মেল আজ কটা নাগাদ ঢুকবে।

ওসি শিয়ালদহ জি আর পি-তে টেলিফোন করে বললেন, আমি বউবাজার থানার ওসি চঞ্চল দাস বলছি। আজ ডাউন দার্জিলিং মেল কখন শিয়ালদা ঢুকবে একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন। বিশেষ দরকার।

টেলিফোনের ওপার থেকে একটু হোল্ড করতে বলা হল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই জি আর পি এনকোয়্যারি থেকে জেনে ওসি কে সেটা বলে দিল। ওসি টেলিফোন নামিয়ে রেখে বললেন, মোটামুটি সাড়ে ছটা থেকে পৌনে সাতটার মধ্যে শিয়ালদায় ইন করবে।

ঠিক আছে। আমাদের গাড়ি আপনার থানার কম্পাউন্ডেই রইল। আমরা অশোকহোটেলেই রাতে থাকব। ছোটখাটো একটা অপারেশন চালাবো রাত এগারোটা থেকে বারোটা নাগাদ। অবস্থা বিশেষে সময় পেছোতে পারি। প্রয়োজন হলে ফোন করব। অপারেশন সাকসেস হলে টেলিফোনে জানিয়ে দেব। কোনো অসুবিধে না হলে আপনাদের ডিস্টার্ব করব না।

থানা থেকে বেরিয়ে তিনজনই হাঁটতে হাঁটতে অশোক হোটেলে চলে এল। হোটেলে একটা ঘরও বুক করে নিল। তিনতলার একটা ঘরই পছন্দ করে নিল ওরা। তিনতলায় নিজেদের ঘরে ঢুকে কেদার ঘড়ি দেখে বললেন, এখন সোয়া ছ'টা বাজে।

ট্রেন শিয়ালদায় ঢোকার কথা সাড়ে ছ'টা থেকে পৌনে সাতটার মধ্যে।—বদ্রী বলল।

কেদার তাঁর ব্যাগ থেকে শ্যামলের আঁকা টাইগারের সম্ভাব্য ছবিটা বের করলেন। সেটা ভাল করে মেলে ধরলেন বেডের ওপর।

বেশ ভালো করে দেখে নিন প্রবীরবাবু। মোটামুটি চেহারা এরকমই হবে

টাইগারের। আমরা যদি হোটেলের সামনেই একে আইডেন্টিফাই করে ফেলি, ত
হলে ঝামেলা অনেকটা কমে যায়।

হ্যাঁ। তা হলে আবার পুলিসের পরিচয় দিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষকে বলে প্রত্যেকটা
ঘরে ঢুকতে হয়।

এখানেই প্ল্যানটা পরিষ্কার করে নিই। বদ্রী নিচে হোটেলের কাউন্টারে
সামনেটাতেই ঘোরাঘুরি করিস। সোফা থাকলে সোফায় বসিস। কাউন্টারে
লোকটার সাথেও আলাপ করে নিস। সন্দেহভাজন যাকে যাকে ঢুকতে দেখবি, সে
কত নম্বর ঘরে যাচ্ছে খেয়াল করে রাখবি।

আমি আর কেদারবাবু হোটেলের বাইরে উল্টোদিকের ফুটে থাকব। তেমন
কোন মানুষকে সন্দেহজনক মনে করলে কাউন্টারের কাছে গিয়ে তোমাকে ইশারায়
জানিয়ে দিয়ে আসব।—এ-কথা বললেন প্রবীরবাবু।

ওরা তিনজন খুব ভাল করে ছবিটা দেখছিল। কেদার বললেন, বদ্রী, তো
নিশ্চয়ই ভুল হবে না? তোর চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন কাজ।

বদ্রীনারায়ণ বলল, দেখা যাক!—ওর দু'চোখে সেই তীব্রতা ফুটে উঠল। ধীরে
ধীরে সে অন্য জগতে চলে যাচ্ছিল। নিজের মনেই বলছিল, মাস-কিলিং করতে
যাদের বিবেকে বাঁধে না, তাদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। যে করেই হোক, খুঁজে নিতে
হবে তাদের! ওরা তিনজন নিচে নেমে পরিকল্পনা মতো যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে
পড়লো। বদ্রীর ঘূর্ণায়মান নীল চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিলো সেই অপরাধীকে, যে নাকি
আন্তর্জাতিক এক্সপ্লোশন এক্সপার্ট। যারা রেলগাড়ি, বাস বা জনবহুল এলাকায়
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকশো মানুষ মেরে ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। ধরতেই হবে
তাদের। না হলে এদের হিংসার বলি হবে শিশু-নারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন সাধারণ
নিরপরাধ মানুষ।

হোটেলের বাইরের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন কেদার মজুমদার আর প্রবীর
ঘোষ। হোটেলে এমন কেউ একটা ঢুকছিল না। একজন একটা বড় ব্যাগে
অনেকগুলো মাদার ডেয়ারির দুধের প্যাকেট নিয়ে হোটেলে ঢুকলো। কেটে গেল
দশ-বারো মিনিট। প্রবীরবাবু ঘড়ি দেখলেন, ছ'টা সাতচল্লিশ।

সময় বয়ে যেতে লাগল। তিনজনেরই চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অপরাধীকে
যার হাতে ভবিষ্যতে কোন বড় ধরনের অন্তর্ঘাত ঘটবে এমনই একটা বড় ষড়য
হয়েছে। যার জন্যই এই টাইগারের আগমন। ছ'টা চুয়ান্ন—পঞ্চান্ন—আটান্ন, সাতটা
বেজে গেল। তিনজনের শিকারী চক্ষু সজাগ। দু'জন অশোক হোটেলের বাইরে
ফুটপাথে শ্যেনচক্ষু হেনে অপেক্ষমান। অন্যদিকে বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি নামে
বিড়ালচক্ষু ছেলেটি হোটেলের রেজিস্ট্রার কাউন্টারের সামনে তার অলৌকিক চোখ

নিয়ে অজানা সেই খুনী অপরাধীর তল্লাশ করতে ব্যস্ত।

সন্ধে সাতটা পাঁচ। শিয়ালদহের এখানটায় এখন জনস্রোত। দু'জনের লক্ষ্য হোটেলে ঢুকবাব গেট। কেদার ভাবছিলেন, ট্রেন কি আরো দেরি করছে! কেদার হাত তিরিশেক দূবে দাঁড়ানো প্রবীর ঘোষের দিকে তাকালেন। প্রবীর ঘোষ চোখের ইশারায় ডানদিকে তাকাতে বললেন তাঁকে। কেদার চকিতে ডানদিকে দেখলেন, পিঠে হ্যাভারস্যাক, ছোট করে চুল ছাঁটা একটা লোক তাকে পাশ কাটিয়ে হোটেলের গেটের দিকে—মুখ দেখতে পাননি কেদার। প্রবীরবাবু মুখ দেখেছেন। সন্দেহ হয়েছে বলে কেদারকে ইশারা করেছেন।

লোকটা গেট দিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়লো। প্রবীর ঘোষকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে কেদার হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

যেই মুহূর্তে লোকটা হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল, কাউন্টারের কাছে চলে গেল, সেই মুহূর্তেই বদ্রীর সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল।

কেদারও ঠিক তার পিছু পিছু ঢুকে বদ্রীকে ইশারায় সতর্ক করে দিয়ে ফের বেরিয়ে গেলেন। কেদার ও প্রবীরবাবু নির্দিষ্ট দূরত্বে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁরা নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন, এই লোকটা না হয়ে যদি অন্য লোক হয়! ওরা কোন ফাঁক রাখতে চাইছিলেন না।

সবকিছু সহজভাবেই চলছিল। বদ্রীর চোখ যেন বিঁধে ফেলতে চাইছিলো লোকটাকে। তবুও মনকে সংযত করার সহজাত শক্তি ছিল তার। তাতেই বদ্রী মনের উত্তেজনা বুঝতে না দিয়ে কান দুটো সজাগ করে রাখল।

আগন্তুক ভাঙা হিন্দী-বাংলা-ইংরাজি মিশিয়ে হোটেল-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলছিল।

ভাই, রুম মিলেগা?

হাঁ মিলেগা।

ভেরি গুড। ফ্রন্ট সাইড, আই মিন, রোডের দিকে, একঠো সিঙ্গল বেড রুম চুজ কর দিজিয়ে।

ঠিক হ্যায়। আচ্ছা রুম হ্যায় একঠো থার্ড ফ্লোরমে। সিঙ্গল বেড। রুম নাম্বার সেভেনটি ফোর।

ও কে। থ্যাঙ্ক য়ু।

বদ্রীর চেতন ও অবচেতনের সমস্ত চিন্তা একই সরলরেখায় চলে এলো। সে শুধু উপলব্ধির সেই জায়গায় পৌঁছতে চাইছিল, যেখানে এই লোকটি সম্পর্কে সঠিক একটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। এ-ই কি টাইগার? অথবা নয়। কোনটা?

বদ্রীনারায়ণ ডুব দিল তার অবচেতনের অতল সাগরে। ওরা খানিকক্ষণ আগেও

শিল্পীর আঁকা যে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখছিলো, বদ্রীর অবচেতন সত্তা, তার তৃতীয় চোখ সেই ছবির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই আগন্তুককে মেলাতে লাগল। শুধু মুখাবয়ব নয়, আগন্তুকের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার যে প্রবৃত্তি, তাও ষোল আনা বুঝতে চাইছিল বদ্রীনারায়ণ।...

...সেই ছবি, আর এই মুখ...অবশ্যই মিল আছে। অসম্ভব মিল। গালভাঙা, চোয়াড়ে, মোঙ্গোলিয়ান মুখের আকৃতি। ছবিতে শিল্পী একটু বেশি চুল দিয়ে ফেলেছিল। আর আগন্তুকের এখানে কদমছাঁট করে ছাঁটা চুল।...নেপাল থেকে এ আসবে। রামকে জেরা করে জানা গিয়েছিল। অবাঙালী। রাম জেরার সময় জানিয়েছিল টাইগারের জাত পরিচয় সে জানে না।...সম্ভবতঃ নেপালী। এখানে বাংলা-হিন্দী-ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছে।...আর এর মনটা কেমন?

আগন্তুক তখন কাউন্টারের সামনে হোটেলের রেজিস্ট্রার খাতায় নাম লেখাচ্ছে। মুখটা সামান্য নিচু করে কাউন্টারের লোকটার সঙ্গে কথা বলছে।...

...বদ্রীনারায়ণ কয়েক পলক লোকটাকে দেখে নিয়ে চোখ বুজে ফেলল।...আঁকা ছবির মুখ।...দুই মুখ এক হয়ে যাচ্ছে।...হ্যাঁ একই! একই লোক!...বদ্রীর অবচেতন মন উথালপাথাল করে উঠলো। চোয়াড়ে, নির্লিপ্ত সেই মুখের কাঠিন্যের আড়ালে চরম নিষ্ঠুরতা দেখতে পেল বদ্রী। মনে হচ্ছে ভুল হয়নি।...

লোকটা টাকা-পয়সা অ্যাডভান্স দিয়ে কাউন্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। বদ্রী তার অবচেতনের অতল সাগর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছিল। চোখ মেলেই বদ্রী দেখলো, অফিস রুম ছেড়ে আগন্তুক এখন সিঁড়ির দিকে। বদ্রী কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল।

আরো ঘণ্টাখানেক প্রবীর ঘোষ, বদ্রী এবং কেদার সেই একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করল। প্রবীর ঘোষ বাইরের এস টি ডি বুথ থেকে একবার বউবাজার থানায় ফোনও করলেন। তারপর ওরা হোটেলে নিজেদের রুমে ঢুকে পড়ল।

রাত দশটা চল্লিশ। তিনতলার ছত্রিশ নম্বর রুম থেকে প্রথমে বেরোলেন কেদার। বেরিয়ে একা একাই চারতলায় উঠে গেলেন। তারপর বেরলো বদ্রী। সে-ও ওপরে উঠে গেল। চল্লিশ সেকেন্ডের মাথায় বেরোলেন প্রবীর ঘোষ।

বদ্রী একটু দূরে দাঁড়িয়ে। কেদার চুয়াত্তর নম্বর ঘরের দরজার সামনে। একটু পাশে প্রবীর ঘোষ।

কেদার কলিং বেল টিপলেন। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। কেদার চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার সামনে। তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ড কেটে গেল।

ও-পাশে খসখস শব্দ পাওয়া গেল। দরজার লক খোলার শব্দ।

দরজা সামান্য ফাঁক হল।

কওন?

রাম।

কওন হো তুম?

রাম হুঁ ম্যায়।

অন্দর আও।

আগন্তুক দরজা খোলামাত্রই কেদার ঘরে ঢুকে পড়লেন। লম্বা-চওড়া চেহারার কেদার যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে, কুঁজো হয়ে ভিজে বেড়ালের মতো লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বেডের দিকে এগিয়ে গেলেন। আগন্তুক দরজা বন্ধ করা মাত্রই ফের কলিং বেলের শব্দ। আগন্তুক এবার সতর্ক। সে কি বিপদের আভাষ পেয়েছে? সে চকিতে কেদারের দিকে তাকাল। কেদার নির্বিকার।

কওন হো সক্‌তা?

আপ ডিনার বোলা?

নেহী।

তো হোটেলকা কোই আদমী হো সক্‌তা।

অল রাইট।

লোকটা এগিয়ে গিয়ে দরজার লক্‌ খুললো। দেখা গেল বদ্রীর মুখ। ওর বিড়ালচোখে তখন সম্মোহনের যাদু।

কেয়া ভাই?

বদ্রী আগন্তুকের চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলো, ডিনার—ভেজ অর নন ভেজ?

বদ্রীনারায়ণের বিড়ালচোখের নীল মণি দু'টোর চৌম্বকশক্তি আগন্তুকের চোখকে সরাতে দিচ্ছিল না। কেদার পেছন থেকে বুঝতে পারছিলেন লোকটার কোমরের পেছন দিকে রিভলবার গোঁজা আছে।

হঠাৎই কেদার নিঃশব্দ পায়ে লোকটার পেছনে দু'পা এগিয়ে বিদ্যুতের গতিতে পাক খেয়ে বাঁ পায়ের পাতা দিয়ে আগন্তুকের মাথার পিছনে আঘাত করলেন। টাল খেয়ে গেল লোকটা। কেদার বুঝলেন, অসম্ভব শক্তি ধরে আগন্তুক। যে কেউ হলে এই আঘাতে লুটিয়ে পড়তো। কেদার দ্বিতীয় আঘাত হানার জন্য দু'পা পিছিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। আগন্তুক কেদারের দিকে ফিরে আঘাত সামলাচ্ছিলো। মস্তিষ্ক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল তার। কোমরে গোঁজা রিভলবারের কথা মনে পড়তেই ডান হাত চলে গেল সেখানে। কেদারের দ্বিতীয় আঘাত আসার আগেই দরজা ঠেলে প্রবীরবাবু ঘরে ঢুকে তাঁর রিভলবারের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন

আগন্তুকের মাথায়। প্রায় তখনই কেদারের ডান পা ছুটে এলো কপালে। উপুড় হয়ে পড়ে যাবাব আগেই কেদার ধরে নিলেন তাকে।

বদ্রী তৈরিই ছিল। আগন্তুকের হাত দুটো পেছনে করে নাইলনের সরু দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল সে।

কেদার বললেন, টাইট করে বাঁধ বদ্রী। এ-সব ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট।

প্রবীরবাবু টাইগারের কোমর থেকে রিভলবারটা বের করে নিলেন। ওকে উপুড় করে ফেলে কেদার পা দুটোও শক্ত করে বেঁধে দিলেন।

টাইগারের হ্যাভারস্যাক খুলে উপুড় করে মেঝেতে ছড়িয়ে দিলো বদ্রী। দশ-পনেরোটা দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা আর একশো টাকার বান্ডিল। ইংরেজিতে লেখা কিছু কাগজপত্র, ম্যাপ, ট্রেনের রিজার্ভেশন টিকিট ছাড়াও টুথপেস্ট, ব্রাশ, শ্যাম্পু, একটা ছোট ছুরি, টর্চ এবং আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস পাওয়া গেল।

এক্সেলেন্স!—চিৎকার করে উঠলো বদ্রী।

কী হলো?—দু'জনের সম্মিলিত জিজ্ঞাসা।

এই যে 'আরণ্যক' গেস্ট হাউসের নাম, ঠিকানা, বুকিং ডেট, রুম নাম্বার সব মজুত।

ব্রেভো বদ্রী। তোর জয় হোক!—লাফ দিয়ে উঠলেন কেদার এবং প্রবীর ঘোষ দু'জনেই।

টাইগারকেই আমরা তা হলে ফাঁদে ফেলতে পেরেছি!

ওরে ব্বাবা! যা পেয়েছি, তা তো একেবারে সোনার খনি!

তা'হলে কেদারদা, এবার তোমার খেল শুরু হবে। তাই তো?

দেখা যাক, কদ্দুর কি করা যায়!—কেদার এখন বেশ গম্ভীর।

পরের দিন তিনজনেরই ব্যস্ততার চূড়ান্ত ছিল। হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে তিনটে সিট রিজার্ভ করা হল, যেটা দু'দিন পরে ছাড়বে। ভাড়া করা অ্যাম্বাসাডর ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হল। বেশ কিছু জিনিসপত্র, পোশাক এবং আরো নানা সরঞ্জাম কিনল ওরা। টাইগারকে কলকাতা পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। টানা বারো ঘণ্টা জেরা করে জানা গেল অনেক তথ্য।

পাঁচ

চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে সকাল ছ'টা নাগাদ স্টেশনে এসে পৌঁছলো কেদার, বদ্রীনারায়ণ এবং প্রবীর ঘোষ। ট্রেন থেকে নেমে ওরা হেঁটেই একটা হোটেলে উঠে

পড়লো। সারাদিন হোটেল থেকে বেরলো না। কেদার একবার বেরিয়ে সেলুনে গেলেন। প্রবীর ঘোষ একবার বেরিয়ে থানায় গিয়েছিলেন। ছিলেন বহুক্ষণ। সারাদিন ঘরের ভেতরে থাকলেও প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিল ওরা।

থানা থেকে সিভিল ড্রেসে এ এস আই এসে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলে গেলেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। সন্ধে ছ'টা নাগাদ একটা ছাই রঙের টাটা সুমো গাড়ি এসে দাঁড়ালো হোটেলের সামনে। ওরা ব্যাগপত্র নিয়ে ঝটপট গাড়িতে উঠে পড়লো। কেদার নিজেকে একটু যেন আড়াল করেই রাখতে চাইছিলেন। হোটেলের টাকা-পয়সা আগেই মেটানো হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল।

পুরুলিয়া শহর পেরিয়ে গাড়ি ছুটলো উচ্চাবচ মালভূমির পথ ধরে। প্রগাঢ় অন্ধকার এখন। আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ঝিকমিক করে জ্বললেও তাদের সেই আলো পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারেনি। গাড়িতে সবাই চুপচাপ। ফাঁকা রাস্তায় তীরের বেগে ছুটছিলো গাড়ি। একটা রেল লাইনের লেভেল ক্রসিংও পার হলো। দু'পাশে ফাঁকা জমি ছিল এতক্ষণ। এবাব বনভূমি। নক্ষত্রভরা আকাশের নিচের পৃথিবীতে অন্ধকারের মধ্যেও এক ধরনের মায়াভরা আলো থাকে। খোলা মাঠে সেই আলো পাওয়া গেলেও যখন বনভূমির ভেতর দিয়ে গাড়ি ছুটছিল, তখন অন্ধকারের কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না।

তবুও সেই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। টাটা সুমো থেকে ড্রাইভার আর প্রবীর ঘোষ নামলেন। প্রবীর ঘোষের হাতে দু'টো বোর্ডের মতো কি যেন! ওঁরা গাড়ির সামনের দিকে গেলেন। ড্রাইভার গাড়ির নাম্বার প্লেট খুলে ফেলে প্রবীরবাবুর হাতে রাখা বোর্ডটা নিয়ে সেখানে লাগিয়ে দিলেন। গাড়ির পেছনে গিয়েও একই কাজ করা হল। হ্যাঁ, গাড়ির নাম্বার প্লেট পাল্টানো হল। গাড়ি ফের ছুটলো প্রচণ্ড গতিতে।

টাটা সুমো ডানদিকে বলরামপুর যাবার রাস্তা না ধরে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল। আবার ছুট। গাড়ির ভেতর কেউ কোনো কথা বলছিল না। আসলে প্রত্যেকের মনের ভেতর এত কথা চলছিল, যে, কেউ আর তা প্রকাশ করে অযথা সময় নষ্ট করতে চাইছিল না।

গাড়ি মানবাজার পেরিয়ে গেল। পেরলো বান্দোয়ান। এখন চারদিকে শুধুই পাহাড় আর পাহাড়। বান্দোয়ান গঞ্জ এলাকা ছাড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে ফের থামল গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছের সারি ঘোর তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছে সবটা অঞ্চল। ড্রাইভার গাড়ির হেডলাইটের আলো নিভিয়ে দিল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল বদ্রীনারায়ণ। নামলেন প্রবীর ঘোষ। কেদার কিন্তু নামলেন না। দেখা গেল, অদূরে

রাস্তার একপাশে পুলিসের দুটো বড় ভ্যান যথাসম্ভব অন্ধকারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবীর ঘোষ আর বদ্রীনারায়ণ দ্রুত হেঁটে পুলিস ভ্যানদুটোর কাছে চলে যাওয়া মাত্রই টাটা সুমোর হেডলাইট জ্বলে উঠল। অন্ধকার চিরে গোঁ গোঁ করতে করতে গাড়ি ছুটলো সামনে। পেছনের লাল আলোয় গাড়ির নকল নম্বর জ্বলজ্বল করছিল। জিরো থ্রি, সেভেন এইট, এইট সিক্স ফাইভ।

কাছে-দূরে অজস্র পাহাড়। আঁধারের রাজত্বে সব যেন মূর্তিমান দানব।

মালভূমির রুক্ষ্ম উঁচুনিচু জমির ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা কংক্রিটের রাস্তা। গাড়ি ছুটে চলেছে। প্রায় আধঘণ্টা হলো। একটা সেতু দেখা যাচ্ছে সামনে। সেতুর চারশো গজ আগেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। বেশ চুপচাপ। গাড়ির হেডলাইটসহ সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। ফলে অন্ধকার এসে ঢেকে দিল সমস্ত কিছু।

হঠাৎই দুটো ছায়ামূর্তি কোত্থেকে এসে উদয় হল। টর্চের চোখা-তীরের মতো আলো গাড়ির সামনে-পেছনে নাম্বার প্লেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফের নিভে গেল। দুই ছায়ামূর্তি গাড়ির দু'দিকের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামল ছোট ছোট করে চুলছাঁটা তাগড়াই চেহারার সেই টাইগার। হ্যাঁ, টাইগারই। ছাইরঙের টাটা সুমো গাড়ি, যার নম্বর জিরো থ্রি, সেভেন এইট, এইট সিক্স ফাইভ, সেই গাড়িতে করে এসে পুরুলিয়া শহর থেকে কুইল্যাপালের এই বন-পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে এসে নামলো সেই সাঙঘাতিক টাইগার। শেষ পর্যন্ত সবরকম বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে টাইগার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এলো।

একজন আগে চলল। পিছনে আর একজন। মাঝখানে বাঘের বাচ্চার মতো হেঁটে যাচ্ছিল টাইগার।

নিস্তব্ধ পৃথিবীতে আবার কোন বড় ধরনের ঘটনার অঙ্ক কষা হচ্ছে।

শাল-সেগুন-আকাশমণি গাছের নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা চড়াইয়ে উঠে তিন তলার সুন্দর গেস্ট হাউস। নাম তার আরণ্যক। ওরা তিনজন গেস্ট হাউসের সীমানার মধ্যে ঢুকে গেল। দু'জনের হাতে টর্চ থাকলেও ওরা কিন্তু টর্চ জ্বালাচ্ছিল না।

নিঃশব্দ পায়ে ওরা 'আরণ্যক'-এ ঢুকলো। সেখানে টাইগারের জন্য অপেক্ষা করছিল আরো কয়েকজন। টাইগার তাদের সঙ্গে করমর্দন করলো। প্রত্যেককেই দেখে মনে হচ্ছে এক একজন যেন ধ্বংসের প্রতীক। লম্বা করিডর। দু'পাশে একের পর এক ঘরগুলো। চৌদ্দ, তেরো, বারো, এগারো, দশ, নয়—এরকম করে এক নম্বর ঘরটা একেবারে সিঁড়ির কাছে। করিডরের শেষ প্রান্তে মুখোমুখি সাত এবং আট নম্বর ঘর। যদিও প্রত্যেকটা ঘরের পেছনে একটা করে সুন্দর সাজানো গোছানো ব্যালকনি আছে, তবুও এই দুটো ঘর একটু বেশি সুবিধে পায়। কারণ এই দুটো ঘরের ব্যালকনির ধরন

অর্ধচন্দ্রাকার এবং যথেষ্ট বড়। এই দুই ঘরের অতিথিরা প্রয়োজনে ব্যালকনিতে চেয়ারে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ছোটখাট মিটিংও করতে পারেন।

আট নম্বর ঘরের ব্যালকনিতে তিনখানা চেয়ারে বসেছিল তিনজন মানুষ। আস্তে আস্তে কথা বলছিল ওরা। আবার সতর্কভাবে এদিক-ওদিক নজরও রাখছিল।

তিনজনের মধ্যে দু'জনের বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। আর একজনের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। বয়স্ক দু'জনই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। তৃতীয়জন মাঝে মাঝেই চেয়ার থেকে উঠে ব্যালকনির রেলিঙে হাত রেখে সামনের লেকের দিকে নজর রাখছিল।

সামনের বিরাট লেকের সৌন্দর্যের কথা মাথায় রেখেই আরণ্যক গেস্ট হাউস তৈরি করা হয়েছে এখানে। লেকের দু'পাশে সবুজ গুল্ম আচ্ছাদিত ছোট বড় পাহাড়। লেকের বুকে দু'-একটা নৌকো, ছোট ছোট বোট ভাসছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, একগুচ্ছ আলোকবিন্দু যেন পথ হারিয়ে হাওয়ায় ভাসছে। একটু পাশেই দেখা যাচ্ছে সেই সড়ক, যে পথ দিয়ে টাইগার এসেছে আরণ্যক-এ। রাতের স্তব্ধতার মাঝখানে মাঝে মাঝেই চমক লাগিয়ে দিচ্ছে সড়কপথে যাওয়া ভারী ভারী ট্রাকের গর্জন।

চেয়ারে যে দু'জন বসে আছে, তারা তাদের ভেতরকার উত্তেজনা চেপে রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তৃতীয় জনের মধ্যেই উশখুশ ভাবটা বেশি। চেয়ারে বসে থাকা দু'জনের মধ্যে যে লোকটা বেশ স্বাস্থ্যবান, সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, টাইগার, ছটফট করার দরকার নেই। রাস্তায় গণ্ডগোল থাকতে পারে। ডিস্টার্বেন্স থাকলে অনেক কিছু পাশ কাটিয়ে আসতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে।

বসে থাকা দ্বিতীয় লোকটা বাঁ হাতের ওপর চিবুকের ভর রেখে প্রথমজনের দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে হল, এই মুহূর্তের পরিস্থিতিকে সে খাটো করে দেখতে চাইছে না।

খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই বোঝা যাচ্ছে গেস্ট হাউস জুড়ে নৈঃশব্দ্য থৈ-থৈ করছে। ঘুমন্তপুরী একেবারে। নাইটগার্ড ছাড়া সবাই ঘুমোচ্ছে। প্রতিটি রুম নিস্তব্ধ। একমাত্র ওরা তিনজনই এখনো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্বল্পবাক লোকটি তার হাতঘড়ি দেখে নিল।

হঠাৎ টাইগার অস্থির হয়ে উঠল—ও লোগ আ রহা হ্যায় ক্যা?

গম্ভীর লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—হ্যাঁ, ওই তো আসছে।

বহু দূরে লেকের ঠিক ওপারে মনে হল একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শুধুই হেডলাইটের আলো। আর কিছু বোঝারও উপায় নেই। ব্যালকনিতে এরা তিনজন

ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছিল।

তখনই একটা তীব্র নীল রঙের তীক্ষ্ণ সরু আলো লেকের ওপারের ঠিক ওই জায়গা থেকে ওদের ব্যালকনি বরাবর ছুটে এল। হ্যাঁ, ওদের লক্ষ্য করেই সেই আলোর সঙ্কেত। তিনজন এটার অপেক্ষাতেই বসে ছিল। লোকগুলো খুশি হয়ে উঠল। ওপার থেকে আসা তীব্র নীল আলোর সঙ্কেত নিভে গেল।

তিনজন তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল।

সেই আলো ফের জ্বলল। এবার ডাইনে-বাঁয়ে আলোটা নাড়ানো হল। নিভে গেল। ফের সেটা জ্বলল। এবার আলো ওপর-নিচে জ্বলল। প্রথম লোকটি এবার ভরাট গলায় বললো, টাইগার পেন্সিল দিয়ে অ্যানসার করো।

টাইগার পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বের করল। এবার সে নীল আলোর উৎস লক্ষ্য করে সেটা তুলে ধরল। এবার টাইগারের হাতের টর্চ থেকে তীব্র সবুজ আলোর রেখা ছুটে গেল। সেই নীল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। টাইগার তার শক্তিশালী পেন্সিল টর্চের সুইচ মোট বারো বার অফ-অন করল।

বন্ধ হয়ে গেল আলোর সঙ্কেত। এরা তিনজন ঘরে ঢুকে পড়ল। টাইগার ঘরে ঢুকেই দশাসই চেহারার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার হামাদ, সাত নাম্বার রুম রেডি হ্যায় তো?

জাস্ট এ মিনিট। এখনো পৌনে দু'ঘণ্টা টাইম আছে। দেখতে হবে ওরা ঠিকঠাক আসছে কি না।

তো ফিন বাহার যানে হোগা।

হ্যাঁ।

টাইগার ফের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনিতে গিয়ে লেকের দিকে তাকালো। ওপার থেকে একটা বোট ছাড়ল। বোটের লণ্ঠনের আলো খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। দেখে টাইগার ফের ঘরে ঢুকল।

অল রাইট। সব ঠিক হ্যায়।—ঘরে ঢুকে হামাদকে এই কথা বলেই টাইগার দেওয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা ব্রিফকেস নিয়ে বসল। সেটা খুলে ফেলল। হামাদ টাইগারকে দেখছিল। টাইগারও হামাদকে এক ঝলক দেখে নিল।

ব্রিফকেসে টাকার বান্ডিল থরে থরে সাজানো। টাকা নয়, টাইগার ব্রিফকেসের খুপরিতে হাত ঢুকিয়ে একটা চাবির গোছা বের করলো। এবার ব্রিফকেস ঝটাস্ করে শব্দ তুলে বন্ধ করে দিল।

নাম্বার সেভ্ন চেক করুঙ্গা।

ঠিক আছে। আমরা আছি।

টাইগার আট নম্বর ঘরের দরজা খুলে করিডরে নেমে মুখোমুখি সাত নম্বর



তিনজনেরই চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অপরাধীকে

ঘরের দরজার সামনে এসে একটুও দেরি করলো না। করিডরের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত একবার দেখে নিয়ে চাবির গোছা থেকে একটা চাবি দরজার লকে ঢুকিয়ে দিল। দরজা খুলল। সে ভেতরে ঢুকেই দরজা লক করে দিল। একটা আলোই শুধু জ্বালল। এবার সে পকেট থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, একটা টেস্টার আর একটা কাঁচি বের করলো। বাঁ দিকের হিপ পকেটে বাঁ হাত ঢুকিয়ে নোটবুকের মতো দেখতে একটা ট্রান্সমিটার বের করলো। ট্রান্সমিটার ডেড করা ছিল। সে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুব দ্রুত সেটার দুটো স্ক্রু খুলে ফেলে কাঁচি দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে ট্রান্সমিটারের ভেতরের একটা সরু তার সামান্য কেটে ফেললো। দুটো পেনসিল ব্যাটারি তার জিন্‌সের জামার পকেট থেকে বের করে ট্রান্সমিটারের নির্দিষ্ট জায়্‌গায় বসিয়ে দিয়ে কাটা তার দুটোর মাথায় টেস্টার ধরে দেখলো, আলো জ্বলে কিনা। না, আলো জ্বলল না। এবার সে ছোট্ট সেই কাঁচির মাথা দিয়ে কাটা তার দুটোকে কাছাকাছি এনে ট্রান্সমিটারের ভেতরে দুটো আলাদা আলাদা স্ক্রুর মধ্যে আটকে দিয়ে টেস্টার দিয়েই স্ক্রু দুটো টাইট করে দিল। টেস্টার ছোঁয়ালেই এবার আলো জ্বলছে।

টাইগার এবার একটু রিল্যাক্স মুডে একটা চেয়ারে বসল। খুশিতে দুবার শিসও দিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই সে দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু করল।

বক্স খাটের হাতলটা ধরে টান দিয়ে টাইগার এবার তার ভেতরের বাক্সটা টেনে আনল। সেখানে রাখা একটা ব্রিফকেস বের করে মেঝেয় নামিয়ে রাখল। এবার

ব্রিফকেস খুলে ভেতরের একটা স্ক্রু খুলে ফেলামাত্রই চামড়ার চাদরটা খুলে এলো। তার মধ্যে একটা ছোট চৌকো খুপরি। সেখানে খুব সহজেই ট্রান্সমিটার রেখে দিয়ে স্ক্রু লাগিয়ে ঠিকঠাক করে ব্রিফকেসটাকে খাটের ডানপাশে রেখে দিল।

এবার সে ঘরের সমস্ত আলো জ্বেলে দিল। বাথরুমের দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বাথরুমও এক নজর দেখে নিল।

আর কিছু দেখার নেই। টাইগার এবার ঘরের দরজা খুলে করিডরে এসে দাঁড়াল। আট নম্বর ঘর খোলাই ছিল। ঢুকে পড়ল সে ঘরের ভেতরে।

হামাদ!

হামাদ আর সেই লোকটা এখন ব্যালকনিতেই।

কি হল টাইগার?

সবকুছ ঠিক হ্যায়।

ওকে। সিন্‌হা, আপনি ডিলিংস-এর আলোচনা চালাবেন। একান্ত দরকার না হলে আমরা এর মধ্যে নাক গলাব না।

দ্বিতীয় লোকটা সামান্য ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো। সিন্‌হা খুব কম কথা বলে। অসম্ভব চাপা। কিন্তু যেটুকু কথা বলে, অথবা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তা খুব জোরের সঙ্গে।

চলমান বোটের লণ্ঠনের আলোটা লেকের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। বেশ কাছে চলে আসায় বোটের গতিও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। বোটের কালো অবয়বটাও ধরা যাচ্ছে এবার।

আকাশে চাঁদ ছিল না। অজস্র নক্ষত্ররাজি বিন-বিন করে জ্বলে আছে সারা আকাশের গায়ে। সামনের বিশাল লেকের জল তির তির করে কেঁপে চলেছে ক্রমাগত। তার থেকে তৈরি হওয়া ছোট ছোট ঢেউ পাড়ে গিয়ে আলতো ধাক্কা দিচ্ছে। আকাশের অজস্র নক্ষত্রের বুনট লেকের গভীর জলের ছায়ায় ধরা পড়েছে কাঁপা কাঁপা ছবিতে।

সেই বোটটা এপারের কাছাকাছি চলে এসেছে।

ওরা তিনজন অধীর প্রতীক্ষায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে।

বোট পাড়ে এসে ঠেকামাত্র টাইগার পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বের করে বোটের ওপর সোজাসুজি ফোকাস করলো। আলো জ্বললো-নিভলো তিনবার। ব্যস ওই পর্যন্তই।

এবার টাইগার ঘরে ঢুকল। ওরা দু'জন ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে রইল। টাইগার

আট নম্বর ঘব থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে সিঁড়ির কাছে এলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় একেবারে গেস্ট হাউসের সিকিউরিটি গার্ডের ঘরে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

লছমন!

জী সাব।

গেট খোল দো। হাম বন্‌দ কর দুঙ্গা।

জী।

লাও। পাঁচশ রূপিয়া লাও আভি। ফির ভি মিলেঙ্গে।

নাইটগার্ডকে টাকা দিয়ে টাইগার সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। গার্ড চাবি হাতে করে নিঃশব্দে মেন গেটের তালা খুলে দিয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

এবার টাইগার তাড়াতাড়ি করে গেট থেকে বেরিয়ে, গেস্ট হাউসের সীমানা পার হয়ে লেকের পাড়ে চলে এলো। ঠিক যেখানটায় বোট থেমেছিল, সেখানটায় এসে দাঁড়াল। বোটে আলো জ্বলছিল না।

টাইগার টাইগারের মতোই নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে, ঢালু পথে কখনো শ্বাপদ জন্তুর মতো ছুটে পৌঁছে গেল ঠিক জায়গাতে। বোটে মাঝি ছাড়া দু'জন লোক বসেছিল। অন্ধকারে ওদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বোঝা যাচ্ছিল না ওদের মুখের ভাব।

টাইগার বলল, এহী তো হ্যায়?

উত্তর এলো, হাঁ, ঠিকই হ্যায়।

বোটের লণ্ঠন টিম-টিম করে জ্বলছে। তাও আবার কোনকিছু দিয়ে ওপরটা আড়াল করা। তাই আলো দেখা যাচ্ছিল না। টাইগার ঢালু পথ বেয়ে জলের কাছে গেল। বোট থেকে দু'জন পাড়ে নামল। দাঁড়িয়ে রইল বোট। দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে টাইগার সোজা গেস্ট হাউসের গেট পেরিয়ে সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে সাত নম্বর ঘরের দরজা খুলে ফেলল।

আইয়ে। দিজ রুম। টাইগার বলল।

ওরা যখন বোট থেকে গেস্ট হাউসে উঠে আসছিল, বোটের মধ্যেই আর একটা লোক হাতের মুঠোয় রিভলবার নিয়ে চারদিকে নজর রাখছিল একেবারে চিতাবাঘের মতো। মনেই হচ্ছিল, একটুও সন্দেহজনক কিছু দেখলে সে সটান ঝাঁপিয়ে পড়বে। বোটের মাঝি তখন চুপচাপ বসে। এদিকে গেস্ট হাউসের পাহারাদার সদর গেট আবার বন্ধ করে দিল নিঃশব্দেই।

সাত নম্বর ঘরে একটা টেবিল ঘিরে চারজন আছে। আগন্তুক দু'জন। সিন্‌হা ও

হামাদ। টাইগার ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। কেন জানি ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ঘর জুড়ে ঘুরছিল টাইগার। হামাদ এবার কথা বলল।

মিস্টার পাণ্ডে। আমাদের প্রথম আলাপের পাট চুকে গেল। এবার কাজের কথায় আসা যাক। লেনদেন ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে হবে। সিন্‌হা সবটা ডিটেলে বলবে। আপাতত কতটা অ্যাডভান্স দিচ্ছি, আর মাল হাতে পেলে কতটা দেব, এসব কথাবার্তা সিন্‌হা বলবে। টাইগার থাকছে এখানে। কোন অসুবিধার ব্যাপার নেই।

পাণ্ডের মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। গলার স্বর ভাঙা। মুখের গড়ন সাদাসিধে। দেখলে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগায় না। সে ঘরের চারদিক দেখছিল। টাইগারকে দেখছিল, দেখছিল হামাদকে। সে বলল, হ্যাঁ, তা হলে বসা যাক।

আমি যাচ্ছি আমার ঘরে। টাইগার থাকছে। সবকিছু নজর রাখবে।

ঠিক আছে। কথা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

হামাদ চলে গেল। সিন্‌হা এখন দারুণ গম্ভীর। একটা বিরাট অঙ্কের টাকার মালপত্র লেনদেন হবে শুধু নয়, বিপজ্জনক কাজ হবে তাই দিয়ে। গোপনীয়তার একটু ফাঁক থাকলে খবর পৌঁছে যাবে পুলিস, সি বি আই এমন কি অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে, যারা বিশ্বজুড়ে কাজ করছে। এবার সি আই এ সম্ভবতঃ চুপ করে বসে থাকবে না। ওদের দিক দিয়েও বিপদ আছে। সব থাবাগুলোই নখ বের করে আছে। এর মধ্যেই কাজ করতে হবে। সিন্‌হা প্রশ্ন করল টাইগারকে, গেটের দারোয়ান পাণ্ডে আর জর্জকে দেখেছে না কি?

না। ওকে আগেই ওর ঘরে চলে যেতে বলেছিলাম।

ফাইন। দারোয়ান পরে বেগড়বাই করবে না তো?

করবে না। তেমন কিছু করলে সরিয়ে দিতে হবে!

সিন্‌হা এবার পাণ্ডেকে বলল, মিস্টার পাণ্ডে, জর্জের পুরো পরিচয়টা তো পেলাম না!

জর্জ ফর্দিনান্দ। মুম্বাইবাসী। ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। একসময় কলকাতাতে ছিলেন দশ বছর।

হ্যালো বলে সিন্‌হা হাত বাড়িয়ে দেওয়ামাত্র জর্জ ফার্দিনান্দ ততোধিক ক্ষিপ্রতায় করমর্দন করে নিল তার সঙ্গে।

হ্যালো সিন্‌হা।

হ্যাঁ। আমাদের আধঘণ্টার মধ্যে কথাবার্তা সারতে হবে। না হলে আপনাদের যেতে দেরি হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা তাই-ই দাঁড়াচ্ছে। অতএব আসল কথায় আসা যাক। আপনারা পনের কিলোগ্রাম মাল আজকের ডিলিংসে পেয়ে যাবেন।

ছয়

ইনকামিং ট্রান্সমিটারের সামনে নিবিষ্ট চোখে বসে আছে দু'জন রেডিও অপারেটর। ওদের সামনের বোর্ডে একটা মানচিত্র আঁকা। বেশি নয়, চার-পাঁচটা রাস্তার রেখা। প্রত্যেকেই সতর্ক। কানে হেডফোন। রেডিও ট্রান্সমিটার থেকে বিপ্ বিপ্ শব্দ হচ্ছিল।

অপারেটরদের একজন অয়্যারলেস সেট অন্ করা মাত্র যন্ত্রটা গোঁ-গোঁ করে উঠল। হ্যালো! রেডিও রুম থেকে বলছি। ওভার।

হ্যাঁ। শুনতে পাচ্ছি। কোন খবর আছে? ওভার।

ট্রান্সমিটার চালু হয়ে গেছে। এর বেশি এগোয়নি। কিছু ডেভলপমেন্ট হলে জানিয়ে দেবো। ওভার।

ও কে। ওভার।

আরণ্যক গেস্ট হাউসের সাত নম্বর রুম। জর্জ, পাণ্ডে আর সিন্‌হা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। টাইগার একইরকমভাবে সারা ঘর জুড়ে ঘোরাঘুরি করছিলো। সিন্‌হা বললো, তা হলে মিস্টার পাণ্ডে, ফিফটি পার্সেন্টি পেমেন্ট আমরা করে দিচ্ছি ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে।

পেমেন্টের আধঘণ্টার মধ্যে যথাস্থানে মাল ডেলিভারি হবে।

তা হলে টাইগার, আর দেরি করার দরকার নেই।—বলে সিন্‌হা হাত দিয়ে ইশারা করা মাত্র টাইগার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। এবার সে আট নম্বর ঘরের কলিং বেল টিপল। হামাদ সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলল। তার হাতে টাকাভর্তি সেই অ্যাটাচি কেস।

কথা হয়েছে?

টাইগার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে হামাদের হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে করিডর দেখে দ্রুতগতিতে ফের ঢুকে গেল সাত নম্বর ঘরে।

হামাদ পাথরকঠিন চোখে টাইগারের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিল। হামাদের চোখ দুটো জ্বলে উঠল যেন।

সাত নম্বর ঘরে খাটের ডানপাশে রাখা খালি অ্যাটাচি কেসটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছে টাইগার।

সব কাজই দ্রুত হচ্ছিল।

টাইগার খোলা অ্যাটাচি কেস টেবিলে রাখল। টাকার বাণ্ডিল গুনছিল জর্জ।

জর্জের হাত থেকে সেগুলো নিয়ে খোলা অ্যাটাচিতে সাজিয়ে রাখছিল পাণ্ডে। টাইগারের তীক্ষ্ণ নজর সেদিকে।

দেখতে দেখতে টাকা ভর্তি অ্যাটাচি খালি হয়ে গেল, খালি অ্যাটাচি ভর্তি হল। কাজ শেষ। টাইগারই একটু ছটফট করছিল। পাণ্ডে আর জর্জ উঠে দাঁড়াল। সিন্‌হা বলল, টাইগারই আপনাদের সঙ্গে যাবে। মালগুলো যাচাই করে নেবে।

যে রাস্তায় আসা, সে রাস্তায় যাওয়া নয়। পাণ্ডের হাতে অ্যাটাচি। সামনে টাইগার। পিছনে জর্জ। কথামতো হোটেলের পেছনের দরজা খুলে রেখেছিল দারোয়ান। সেই পথেই ওরা বেরিয়ে ঘুরপথে পাকা রাস্তায় উঠে এলো।

একটা ভাঙাচোরা জিপগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। টাইগার ইশারা করল তাতে উঠতে। জর্জ মুখ বাঁকাল—এই গাড়ি! টাইগার বলল, দেখতে যাই হোক, ইঞ্জিন একেবারে টাট্টু ঘোড়া। বুঝেশুনেই এই গাড়ি।

তিনজন উঠে বসামাত্রই জিপ দৌড়াতে শুরু করল। সত্যিই টাট্টু ঘোড়া।

রেডিওরুমে দু'জন অপারেটরই নড়েচড়ে বসেছে। তাদের কাঙ্ক্ষিত ইনকামিং ট্রান্সমিটারের বিপ্‌ বিপ্‌ শব্দ আরো জোরালো হয়েছে। সামনের মানচিত্রের নিচের দিকে টিপ্‌-টিপ্‌ করে যে আলোটা জ্বলছিল, সেটা এবার মধ্যের রেখা ধরে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

অপারেটরের হাতের অয়্যারলেস সরব হয়ে উঠল।

হ্যালো, রেডিও রুম থেকে বলছি। কুইল্যাপাল ছেড়ে ঝাড়গ্রামের রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। ট্রান্সমিটার সিগন্যাল চলতে শুরু করেছে। ওভার।

ঠিক আছে। স্পিড কেমন? ওভার।

ঘণ্টায় নব্বই থেকে একশো দশ। ওভার।

সিগন্যাল স্টপ হলে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবেন। ওভার।

অয়্যারলেস অফ করে দুই রেডিও অপারেটর ট্রান্সমিটার সিগন্যালের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগল।

পাহাড়-জঙ্গল-লেক ছোঁয়া আরণ্যক গেস্ট হাউসকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকার ষাট থেকে সত্তর কিলোমিরের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় অন্তত পক্ষে কুড়িখানা গাড়ি সক্রিয় হয়ে উঠল। আধঘণ্টার মধ্যে গাড়িগুলোর বৃত্ত ছোট হয়ে এলো।

আরণ্যক গেস্ট হাউস এখন ঘুমে অচেতন। অবশ্য কিচেন থেকে বাসন-কোসনের শব্দ, জল ভরার শব্দ ভেসে আসছিল। আট নম্বর ঘরে চিন্তিতমুখে বসে

ছিল হামাদ আর সিন্‌হা। সিন্‌হা কথা বলল।

বুঝলে হামাদ। এই মুহূর্তে আমরা একেবারে অথৈ জলে। হাতে মাল আসেনি। টাকা বেরিয়ে গেছে। শুধুমাত্র টাইগারের রেসপন্সিবিলিটির ওপর সবটা নির্ভর করছে। মাঝখানে দুই পার্টির মধ্যে কেউ যদি কোন কন্সপিরেসি করে, আমরা একদম ডুবে যাব।

আচ্ছা, টাইগারকে তুমি এর আগে কখনো দেখেছ?

না। কিন্তু যে এজেন্সি ওকে পাঠিয়েছে, তারা আমাদের কাছে দারুণ নির্ভরযোগ্য।

সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, টাইগারের বায়োডাটায় ও কি কি ভাষায় কথা বলতে পারে বলে বলা হয়েছিল?

ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি, নেপালি।

ওর মুখ দিয়ে মাঝে মাঝেই পরিষ্কার বাংলা কথা বেরিয়ে আসছিল।

অস্বাভাবিক কিছু নয়। আফগানিস্তান বর্ডারে প্রশিক্ষণ পাওয়া এ-সব কমান্ডোকে অপারেশন ক্ষেত্র অনুযায়ী সবই গুলে খাওয়ানো হয়েছে।

সবই জানি। তবু কেন মন খচ-খচ করছে!

বাজে চিন্তা ছাড়ো! আমরা আর কতক্ষণের মধ্যে বেরবো?

কুড়ি মিনিটের মধ্যে। টাইগার সমস্ত কিছুই গুছিয়ে রেখে গেছে। কথামতো দারোয়ান পেছনের গেট খোলা রাখবে। এখনো পর্যন্ত টাইগারের কাজে কোনো গলতি নেই।

তাহলে সমস্ত কিছু দেখে নেওয়া যাক। একটা টুকরো কাগজও যেন পড়ে না থাকে।

তাহলে সাত নম্বর থেকেই শুরু করা যাক।

সিন্‌হা আর হামাদ আট থেকে সাত নম্বর রুমে চলে এলো। দরজা বন্ধ করে ঘরের সমস্ত আলো জ্বেলে দিল। ঘরটা দিন হয়ে গেল। দু'জনের সতর্ক চোখ ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁজে দেখছিল কোনো প্রমাণ কিছু থেকে গেল কিনা। হামাদ খাটের ডানদিক থেকে একটা টুকরো তার তুলে নিল।

সিন্‌হা। এদিকে দেখ। এটা কি?

একটা কাটা তার দেখছি। দেখি দেখি?

সিন্‌হা হামাদের হাত থেকে তারটা নিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে দেখতে লাগল। হামাদ তখন পাগলের মতো তন্নতন্ন করে খুঁজে চলেছে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

আরণ্যক গেস্ট হাউসকে ঘিরে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ছুটে আসা গাড়ির বৃত্ত সঙ্কুচিত



নিশব্দ পায়ে ওরা অরণ্যকে ঢুকলো

হতে হতে বারো কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে।

রাত দুটো দশ। জর্জ আর পাণ্ডে টাইগারকে বলল জিপ থামাতে। লজঝর মার্কা দেখতে সেই দুরন্ত জিপটা দাঁড়িয়ে পড়ল একটা পি ডব্লু ডি-র ভাঙাচোরা মানুষবিহীন ভূতুড়ে বাড়ির সামনে।

পাণ্ডে আর জর্জ লাফ দিয়ে নামলো। টাইগার জিপে বসে রইল। একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ ভেসে এলো পোড়ো বাড়ির পেছন থেকে। বার বার তিনবার। তারপর সবকিছু চুপচাপ। পোড়ো বাড়ির পাশ দিয়ে একটা টর্চের আলো এগিয়ে আসছিল। জিপের মধ্যে টাকাভর্তি অ্যাটাচি কেস নিয়ে বসেছিল টাইগার।

রেডিওরুম থেকে অপারেটর শুধু এই কথাই জানালো ওয়্যারলেসে যে, ট্রান্সমিটার সিগন্যাল চলতে চলতে এবার থেমেছে। সেখান থেকে সামনে এগোতে গেলে দুটো রাস্তা পাওয়া যাবে।

জিপের পাশে টাইগারের সামনে এসে দাঁড়াল এবার জর্জ ফর্দিনান্দ আর একটা নতুন লোক। লোকটার একেবারে ডাকাবুকো চেহারা। লোকটার হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট। সেটা সে তুলে দিল টাইগারের হাতে।

ফিফটিন কিলোগ্রামস সাইক্লোট্রাইমেথিলিন ট্রাইনাট্র্যামিন।

টাইগার পলিথিন প্যাকেটের ওপরের বাঁধন খুলে ফেলল। ওপরের শক্ত পলিথিন প্যাকেটের ভেতর আরো একটা প্যাকেটে একতাল নরম কাদার মতো কিছু রয়েছে।

টাইগার খুলে ফেলল ভেতরের প্যাকেটটাও। এবার ডান হাত ঢুকিয়ে সেই কাদার তালের মতো জিনিসটা দেখে নিল অনেকক্ষণ ধরে। জর্জ তার হাতের টর্চের আলো ফোকাস করল সেই প্যাকেটের ভেতব। হাসতে হাসতে বলল, কাস্টমারকে সবচেয়ে ভাল জিনিসই আমরা সাপ্লাই দিই।

টাইগার এ-কথার কোনো উত্তর দিল না। ভেতরের প্যাকেট এবং পরে ওপরের প্যাকেটের বাঁধন টাইট করে বেঁধে ফেলল। খুব তৎপর হয়ে উঠল সে। টাকাভর্তি অ্যাটাচি কেস তুলে দিল জর্জ ফার্দিনান্দের হাতে। মুখে হাসি ফার্দিনান্দের।

বাদবাকি টাকা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাতেই পাওয়া যাবে।

ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে এবার যাচ্ছে আমাদের তেজেন্দর। অল ইন্ডিয়া লেভেলের বক্সার।—বলল ফার্দিনান্দ।

টাইগারের মনে হল, এই কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হল। টাইগার

চোয়াল কঠিন করে দেঁতো হাসি হেসে বলল, অল রাইট।

ফার্দিনান্দ ততক্ষণে পোড়ো বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে। তার হাতে অ্যাটাচি-ভর্তি টাকা। যে অ্যাটাচির গোপন খুপরিতে টাইগার একটা জীবন্ত ট্রান্সমিটার পুরে দিয়েছিল ঘণ্টাচারেক আগে।

ফার্দিনান্দ সেই পি ডব্লু ডি-র পোড়ো বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হওয়ামাত্রই ভাঙাচোরা এই জিপের শক্তিশালী ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল। ছুটতে শুরু করলো দুরন্ত বেগে। এক হ্যাঁচকায় তেজেন্দরের মাথা ঠুকে গেল।

আবার সমস্ত কিছু শুনশান। কিন্তু পাক্কা আড়াই মিনিট পরে এখানে যা ঘটল, তাতে এখানকার পরিস্থিতি শুনশান, এমন কথা বলার আর কোনো অবকাশ রইল না।

আড়াই মিনিটের মাথায় দেখা গেল, বেশ বড় একটা পুলিস ভ্যান প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল একই জায়গায়। পঁচিশ থেকে ত্রিশজন সশস্ত্র পুলিসের একটি দল পি ডব্লু ডি-র ভাঙাচোরা মনুষ্যবিহীন বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল নিমেষে। টুটে গেল নৈঃশব্দ্য। শক্তিশালী সার্চলাইট চারদিক থেকে বাড়িটাকে আলোকিত করে তুলল। পুলিস ভ্যান থেকে এক অফিসার বেরিয়ে এসে ব্যাটারিচালিত হ্যান্ড মাইকে বলতে লাগলেন, বাড়ির মধ্যে যারা আছো, মাথার ওপর হাত তুলে সোজা বেরিয়ে এসো! আমরা কোনো সময় নষ্ট করব না। এক থেকে দশ গোনার মধ্যে না বেরোলে আমরা গুলি চালাতে শুরু করব।

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট-নয়-দশ!

কেউ বেরলো না পোড়ো বাড়ি থেকে।

ফায়ার!

গুরুম-গুরুম শব্দে পঁচিশ ত্রিশখানা রাইফেল গর্জে উঠল। রাইফেলের মুখ ছিল বাড়ির ওপর দিক বরাবর। ফলে ওপরের কার্নিস, ছাদের পাঁচিল ভেঙে গোটা গোটা ইঁট, সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে পড়তে লাগল দমাস-দমাস শব্দ করে।

ফায়ার! কোনো খাতির নেই। বেরিয়ে এসো, অথবা মরো। ফায়ার! ফায়ার! রাইফেলের কানফাটানো শব্দ, আর ছাতাপড়া বাড়ির ইঁটকাঠ দরজা-জানালা ভেঙে পড়ার শব্দে জায়গাটা যেন নিমেষে যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠল। বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল—বাঁচাও! বাঁচাও! আমরা সারেন্ডার করছি।

পুলিস অফিসার হ্যান্ড মাইকে হুকুম দিলেন—স্টপ!

নিমেষে সব থেমে গেল। রাইফেলের শব্দগুলো তখনো দূরবর্তী পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি তুলছিল। বাড়িটা থেকে তখনো ঝুর-ঝুর করে ভেঙে পড়ছিল ইঁট-বালি-কাঠের টুকরো ইত্যাদি।

সার্চলাইটের তীব্র আলোয় দেখা গেল, মোট চারজন মানুষ মাথা নিচু করে হাত ওপরে তুলে সরু পথ ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখা গেল, পাণ্ডে আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। জর্জ ফার্দিনান্দের কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। আরো দুটো যণ্ডামার্কা অচেনা লোক—মোট চারজন।

পাকারাস্তায় উঠে আসামাত্র অফিসারের নির্দেশ পেয়ে ছ'জন রাইফেলধারী কনস্টেবল ওদের ঘিরে ফেলল। আরো চারজন পুলিস এগিয়ে এসে ওদের শরীর তল্লাশি করে দেখে নিল। তারপরই চারজনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে তোলা হল পুলিস ভ্যানে।

পোড়ো বাড়ির ভেতরে ঢুকে একদল পুলিস টাকাভর্তি ট্রান্সমিটার সেট করা অ্যাটাচি কেস উদ্ধার করে নিয়ে এলো।

পুলিস অফিসার তাঁর হাতের অয়্যারলেস সেট অন্ করে কথা বলা শুরু করলেন।

হ্যালো, রেডিও কন্ট্রোল। আমি চ্যাটার্জি বলছি। ওভার।

শুনতে পাচ্ছি স্যার। অপারেশন কমপ্লিট? ওভার।

হ্যাঁ। ট্রান্সমিটার কি সিগন্যাল পাঠাচ্ছে? ওভার।

হ্যাঁ স্যার। পাঠাচ্ছে। ওটা কি আপনাদের হাতে? ওভার।

হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। ছাড়ছি। ওভার।

সমস্ত অপারেশনটুকু সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল সতের মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডের মতো।

চারজন ধ্বংসকারী অপরাধীকে নিয়ে খুব দ্রুত পুলিসভ্যান ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেল। বন-পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামের মানুষগুলোর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রাইফেলের শব্দে। অসীম নিস্তব্ধতা ফের নেমে আসা সত্ত্বেও দূরের পাহাড়গাত্রে যেন তখনো রাইফেলের শব্দগুলো প্রতিধ্বনি থেকে আরো প্রতিধ্বনির জন্ম দিচ্ছিল।

আগের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ খারিজ। আরণ্যক গেস্ট হাউস থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে পড়েছে হামাদ আর সিন্‌হা। যদিও টাইগারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের দরকারী জিনিসটা নিয়ে আরণ্যকে ফিরে আসার কথা ছিল।

কিন্তু হামাদ চিন্তিত! সবকিছু কি ঠিকঠাক চলছে! যদিও বেঠিক কিছু খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের হাতের বাইরে সবটা।

আমাদের প্ল্যানিংয়ে এটা একটা ফাঁক। টাইগারের সঙ্গে আমাদের লোক থাকা উচিত ছিল। কথাটা বলল হামাদ।

কিন্তু কন্ট্রোলের কথা অনুযায়ী অনেকের চেয়ে বেশি আমাদের লোক হল টাইগার।

কিন্তু কেন জানি, গত সন্ধে থেকে মাঝরাত, কখনোই আমি ওকে নিজেদের লোক হিসেবে মনে করার চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি।

আসলে সে সাংঘাতিক ডায়নামিক। যন্ত্রের মতো কাজ এবং সাফল্য আয়ত্ত করাই সে বোঝে।

ওর মনের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়নি। সবসময় নেকড়ের মতো ওঁৎ পেতে আছে। গরগর করে গজরাচ্ছে অলওয়েজ।

সন্ত্রাসবাদের সর্বোচ্চ শিক্ষা এটাই। তাই আমরা চাই। চাই পশুর মতো আচরণ।

হামাদ আর সিন্‌হা টাইগার সম্পর্কে নিজেরা আলোচনা করছিল গাড়িতেই। মারুতি চালাচ্ছিল হামাদ। পাশে সিন্‌হা।

এদের মারুতির আধমাইল দূরত্ব রেখে চলছিল একটা ট্রাক। ট্রাকে অয়্যারলেস সেটে কান রেখে একজন সেনাবাহিনীর মেজর কথা বলে যাচ্ছিলেন তাঁদের হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে। পাশে স্টেনগান হাতে চার জওয়ান চিতাবাঘের চাহনি নিয়ে সামনে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল।

•

রাত তিনটে বত্রিশ। সন্ধে থেকে ঘটনাচক্র নিজের আবর্তে ঘুরে চলেছে। আর এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে আকাশ আলোকময় হয়ে উঠতে শুরু করবে। চক্রান্ত, অপরাধ যতটা সম্ভব রাতের অন্ধকারেই নির্বিঘ্নে হয়। তাই খুনেরা তাদের লেনদেনের কাজ এই সময়টুকুর মধ্যেই শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল।

তেজেন্দরকে নিয়ে টাইগারের জিপ ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। অন্ধকারের বুক চিরে জিপের হেডলাইটের আলো পিচঢালা রাস্তাকে আলোকিত করতে করতে এগোচ্ছে। এবার মূল রাস্তা ছেড়ে জিপ ডানদিকে একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় নেমে পড়ল।

একইভাবে হামাদ তার মারুতিকে মূল রাস্তা থেকে বাঁ-দিকের সরু রাস্তায় নামিয়ে দিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে টাইগারদের জিপের সঙ্গে পরিকল্পনামাফিক দেখা হয়ে গেল হামাদের মারুতির।

জিপ থেকে লাফ দিয়ে নামল টাইগার। হামাদ মারুতির চালকের আসন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টাইগারকে দেখছিল। এখন ভোর চারটে বেজে চার মিনিট। পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। অন্ধকার নেই কোথাও।

টাইগার হামাদকে বাদবাকি টাকার অ্যাটাচি নিয়ে ইশারায় বেরিয়ে আসতে

বলল। মুখে বলল, হামাদ, মাল পুরা মিল গিয়া।

হামাদ টাকাভর্তি অ্যাটাচি কেস নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। সেটা তুলে দিল টাইগারের হাতে। টাইগার সেটা জিপে বসে থাকা বক্সার তেজেন্দরের হাতে তুলে দিয়ে নিজে তুলে নিল সেই কাদার তালের মতো জিনিসের পলিথিন প্যাকেটটা।

টাইগার হাত তুলে লাইন ক্লিয়ার সঙ্কেত করামাত্র জিপ ছুটল সোজাসুজি হামাদের মারুতিকে পাশ কাটিয়ে।

আধ মাইল ছুটেই জিপ দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সামনের বনেট খুলে ট্রাক ড্রাইভার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছিল। তেজেন্দর চিৎকার করে বলল, কেয়া ভাই-ই-ই! বিগড় গিয়া?

লোকটা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তবুও তেজেন্দরের কেমন একটা সন্দেহ হল। ফাঁদ নয়তো! নিজের কোমরের রিভলবার একবার পরখ করে নিয়ে সে জিপ থেকে নেমে ট্রাক ড্রাইভারের কাছে এলো। তেজেন্দর দেখছিল, পাশে যেটুকু জায়গা আছে, দু'-চারটে গাছের ডাল ভেঙে দিলে জিপ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

ট্রাকের ড্রাইভার মাথা নিচু করে ইঞ্জিনের তেলের পাইপ নাড়াচাড়া করছিল। তেজেন্দর জিজ্ঞেস করল, কেয়া ভাই, বঢ়িয়া গড়বড়?

জী।—বলে ট্রাক ড্রাইভার মাথা তুলল। পরমুহূর্তেই চ্যাম্পিয়ান বক্সার তেজেন্দর সিংয়ের বাঁ কান ঘেঁষে আছড়ে পড়ল দু'শো পাউন্ডের ঘুঁষি। আর্ত চিৎকার করে পাকা রাস্তার ওপর কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

তক্ষুণি ট্রাকের পেছন থেকে ছুটে এলো স্টেনগানধারী সেনা জওয়ান।

সেনা-মেজর ওয়্যারলেসে হেড কোয়ার্টারকে জানিয়ে দিলেন, পিসফুল অপারেশন। নো এনি প্রবলেম।

মারুতি হামাদই চালাচ্ছিল। টাইগার সামনে হামাদের পাশে। এবার পেছনে চলে গেছে সিন্‌হা। ওরা কিছু একটা ভেবেছে। হামাদ বলল, টাইগার, এবার আমরা কী করব?

গেস্ট হাউস যানা জরুরি হ্যায় কেয়া?

না, আমরা আরণ্যকে আর ফিরে যাচ্ছি না।

বাট, কিঁউ?

মনে হচ্ছে, কোথাও কোন একটা গণ্ডগোল হয়েছে!

হোয়াট!

হ্যাঁ। গেস্ট হাউসের সাত নম্বর রুম তো তোমার এক্তিয়ারে ছিল। সেখানে কিছু

সন্দেহজনক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। টাইগার, তুমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?

হোয়াট ডু ইউ মিন!

হামাদ তীক্ষ্ণ চোখে টাইগারকে দেখছিল। সে ফের বলল, আচ্ছা টাইগার, আমাদের মাল ঠিক আছে?

একদম পারফেক্ট। ফিফটিন কিলোগ্রামস নিট।—বলেই টাইগার সেই পলিথিন প্যাকেটটা পেছনের সিটে সিন্‌হার হাতে দিয়ে দিল।—চেক কর লিজিয়ে।

তুমি তো এক্সপার্ট টাইগার। তুমি দেখে নিয়েছ। ব্যস! ও কে।

হামাদ হাতঘড়ির দিকে দেখে নিল একবার। সকাল হয়ে গেছে। পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

উল্টো দিক থেকে একটা কালো জিপ চলে গেল। জিপটা কিন্তু খানিক গিয়ে ব্যাক গিয়ারে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এবার প্রচণ্ড জোরে ছুটতে ছুটতে হামাদের মারুতির পিছনে চলতে লাগল একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

তার খানিক পিছনে দেখা গেল একটা ট্রাককে। ট্রাক জোরে ছুটে এসে জিপকে ধরে ফেলল। জিপ জায়গা করে দিল। ট্রাক জিপকে পিছনে ফেলে চলতে লাগল। ট্রাকের পিছনে কেউ থাকলেও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। জিপের বাঁ-দিক থেকে একজন হাত নাড়ল। ট্রাকের চালকের পাশের লোকটার হাতে সেলুলার ফোন। জিপের চালকের পাশের লোকটার হাতেও সেলুলার ফোন।

জিপ আর ট্রাক আগু-পিছু করে চলছিল। কখনো জিপ আগে, কখনো ট্রাক আগে। সেলুলারে কথা হচ্ছিল।

হ্যালো, মেজর। সাবধানে এগোতে হবে।

হ্যাঁ। যদি ওটা ওদের হাতে এসে গিয়ে থাকে, তবে মারুতি এখন জতুগৃহ। টেকনিক্যালি ডিল করতে হবে। বিকজ 'সাইক্লোনাইট' ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস।

হ্যাঁ। না হলে আমাদের টাইগারের প্রাণ সংশয় হয়ে যাবে।

সময়ের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এখনো সব ঠিকঠাকই চলছে। ট্রান্সমিটারের সিগনাল পেয়ে যাচ্ছি।

মিস্টার ঘোষ, আপনারা একটু এগিয়ে যান। ওরা আমাদের দূরবীণের আওতার মধ্যেই আছে। সব স্বাভাবিক চলছে এখনো।

জিপ এবার ট্রাকের সঙ্গে ব্যবধান বাড়িয়ে জোরে ছুটলো। জিপের আরোহীরা এবার মারুতিকে দেখতে পাচ্ছিল।

মালভূমির উঁচু নিচু পথ। বহু দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে, খেলনা গাড়ির মতো মারুতি ছুটে চলেছে। উল্টোদিক থেকে একটা যাত্রী বোঝাই বাস মারুতিকে পেরিয়ে

আসছে। সকালের ফার্স্ট বাস বোধহয়। বাসের ছাদেও অনেক লোক।

মারুতিতে হামাদ, সিন্‌হা এবং টাইগার সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। হামাদ এবং সিন্‌হা বেশ আক্রমণাত্মক। টাইগার খুব সাবধানে হিসেব করে কথা বলছিল। হামাদ মাঝে মাঝেই রেগে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, আমরা কোন রিস্ক নেব না বলেই সেলফোন ব্যবহার করিনি। তবুও আরণ্যক গেস্ট হাউসে অন্তত একটা টেলিফোন আসার কথা ছিল এ-পর্যন্ত কাজের পরিস্থিতি জানানোর জন্য। কাজেই তুমিই বলতে পারো টাইগার, কাজগুলো ঠিকঠাক হল কিনা?

বিলকুল ঠিক।

কিন্তু টেলিফোন পেলাম না কেন?

নেহী মালুম।

এখানেই তোমাকে আমরা সন্দেহ করছি। দ্বিতীয়তঃ, সাত নম্বর রুমে আমরা পেয়েছি কাটা তার, ছোট একটা স্ক্রু, পেনসিল ব্যাটারির প্লাস্টিক কভার। এগুলো পাওয়া গেছে সেই ঘরে, যে ঘরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তোমার ওপর।

রং অ্যালিগেশন!—টাইগার চিৎকার করে উঠল।

চিৎকার না করে যুক্তি দিয়ে উত্তর দাও টাইগার। পেছন থেকে সিন্‌হা বলল। সিন্‌হার হাতে রিভলবার।

ঝুটা অ্যালিগেশনকা কোই অ্যান্সার নেহী!

ঠিক আছে।—বলেই হামাদ গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল। চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। হামাদ মারুতির দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। সিন্‌হাও বাইরে চলে এসেছে। হামাদ চিৎকার করে বলল, টাইগার, বাইরে এসো! আমরা এ-ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিই!

টাইগার এক মুহূর্ত ভাবল। দ্রুত ঠিক করলো, এবার কী করবে। সে দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় নামলো। সকালের রোদ্দুর ধুইয়ে দিচ্ছিল কংক্রিটের পথ। তিনজনের লম্বা লম্বা ছায়া রাস্তা পেরিয়ে পাশের পাথুরে জমিতে হারিয়ে গিয়েছে।

টাইগার বুঝতে পারছিল, সিন্‌হা আর হামাদ দু'জনের পকেটেই রিভলবার আছে। টাইগার একটু চিন্তিত। চিন্তার দুটো কারণ, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেছে। দুই, মারুতির এত কাছে দাঁড়িয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা যাবে না। মারুতিতে পনেরো কিলোগ্রাম বিস্ফোরক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। গুলিগোলা চললে তা যে কতবড় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে টাইগার ওয়াকিবহাল।

টাইগার কৌশল নিল, কথার মারপ্যাঁচ চালিয়ে যেতে হবে। মারুতি থেকে যতটা



টাইগার জানে, সিন্‌হার চেয়ে হামাদ অনেক বেশি ত্বরিৎগতিসম্পন্ন

সম্ভব দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় এদের, ততটাই ভাল।

ট্রাকে যিনি সেলুলার নিয়ে বসেছিলেন, তিনি নড়েচড়ে বসলেন। টকাটক করে বোতাম টিপেই দ্রুত বললেন, হ্যালো মিস্টার ঘোষ। আরো একটু এগিয়ে যান। মারুতি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। এই সুযোগটা নেবার চেষ্টা করুন। তবে কোন গোলমালও হতে পারে! ব্যাপারটা বুঝে নেবেন ভাল করে। আপনারা স্টার্ট করলেই আমরা ঝাঁপাবো।

জিপ এবার স্পিড বাড়িয়ে দিল। উল্টোদিক থেকে একটা ইঁট বোঝাই লরি চলে গেল।

দাঁড়িয়ে থাকা মারুতির দু'শো গজ তফাতে একটা কালভার্ট। কথা বলতে বলতে ওরা টাইগারকে নিয়ে সেই কালভার্টের ওপর এসে দাঁড়াল। টাইগার বুঝতে পারছিল, হামাদ আর সিন্‌হা তার ওপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ওরা মেরে ফেলতেই চাইছে ওকে।

টাইগার জানে, সিন্‌হার চেয়ে হামাদ অনেক বেশি ত্বরিৎগতিসম্পন্ন। তবে নিষ্ঠুরতায় দু'জনের কেউ কম যায় না। টাইগার কথা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এ-পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ দারুণভাবে শেষ হয়েছে। আপনাদের মাল আপনারা

বুঝে নিয়েছেন—

হ্যাঁ। এত ভাল পরিষ্কার বাংলা তুমি কোথায় শিখলে?

তখনই পেছনে জিপের শব্দ শুনতে পেল ওরা। দাঁড়িয়ে থাকা মারুতিকে টপকে দাঁড়িয়ে পড়ল জিপ। জিপের পেছন থেকে নামল বদ্রীনারায়ণ।

আচ্ছা, এই জায়গার নাম কি ভগবানটাঁড়?—প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে বদ্রী আরো এগিয়ে এলো ওদের দিকে। একটা অল্পবয়সী ছেলেকে দেখে হামাদ ও সিন্‌হা কোনো সন্দেহ করেনি ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ করে এই উৎপাত ওদের কাছে স্বভাবতই প্রচণ্ড বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল। হামাদ চিৎকার করে বলল, না ভাই! আমরা এ-জায়গাটার নাম জানি না!

এই ম্যাপটা একটু দেখুন তো! বলে বদ্রী খুব তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো।

চিতা যেমন করে প্রায় উড়ে গিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই একইভাবে তখন হঠাৎ করে টাইগার উড়ে গিয়ে শরীরটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে হামাদের শরীরের ওপর গিয়ে পড়ল। হামাদ সশব্দে পিচ রাস্তার ওপর পড়লো। কানের পাশ ফেটে সঙ্গে সঙ্গেই রক্তরেখা দেখা দিয়েছে হামাদের।

তবুও উঠে পড়েছে হামাদ। তার সন্দেহ মিথ্যে নয়, বুঝল হামাদ। চিৎকার করে বলল, সিন্‌হা! বেইমানটাকে গুলি করে মেরে ফেল্‌।

সিন্‌হা পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল। বদ্রীনারায়ণ ততক্ষণে ওর পকেট থেকে দু'মুখো ছুরিটা বের করে সিন্‌হার ডান হাত লক্ষ্য করে চালিয়ে দিয়েছে।

হতভম্ভ সিন্‌হা আর হামাদকে চমকে দিয়ে জিপ থেকে নেমে এসে প্রবীর ঘোষ বজ্রনির্ঘোষে হুঙ্কার দিলেন, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, সে সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকো। না হলে এক এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দোবো!

টাইগার ততক্ষণে খুলে ফেলেছে তার মুখোশ। মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে গোয়েন্দা কেদার মজুমদারের মুখ। দেখে হামাদ আর সিন্‌হার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা।

আর ঠিক তক্ষুণি বিকট শব্দ করে ছুটে এসে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সেনাবাহিনীর সেই ট্রাক। এক সেনা অফিসার আর সশস্ত্র পাঁচ জওয়ান ছুটে এলো কালভার্টের সামনে। হামাদ আর সিন্‌হার দিকে ছুটে গিয়ে ওদের কোমরে গোঁজা রিভলবার বের করে ধাক্কা দিতে দিতে ট্রাকে নিয়ে গিয়ে তুলল।

অফিসার হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে কেদার আর প্রবীরবাবুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

কেদার বললেন, এখনো কাজ শেষ হয়নি। বিস্ফোরকটা ওই মারুতিতে আছে।

ওটার ব্যবস্থা করুন। এক্সপ্লোশন এক্সপার্টের ভূমিকায় সারা রাত অভিনয় করেছি। এবারে সত্যিকারের এক্সপার্টের হাতে যাক ওই ভয়ানক জিনিস।

প্রবীরবাবু সেনা অফিসারকে বললেন, আমি প্রবীর ঘোষ, সদর থানার সেকেন্ড অফিসার। আপনার নামটা জানা হল না।

আমি রতিকান্ত বড়ুয়া। আসামের বঙ্গাইগাঁওয়ে বহুদিন ধরে আছি। এক্সপ্লোশনের ব্যাপারে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছিলাম কাশ্মীরে ছিলাম যখন। চলুন জিনিসটা পরখ করে নিই।

বিধ্বস্ত হামাদ আর সিন্‌হা মিলিটারি ট্রাকে বসে হতবাক হয়ে ভাবছিল, এ কি হল! আমাদের এত নিখুঁত পরিকল্পনার ওপর এরা এমন নিপুণ অপারেশন চালাল কিভাবে? কোথায় গলতি ছিল? কে ধরা পড়ে সব ফাঁস করেছে কে জানে!

পরের দিন বিকেলবেলা সদর শহরের ফ্রেন্ডস লজ আবাসিক হোটেলের ছিয়াত্তর নম্বর ঘরে জমজমাট আড্ডায় বসেছিলেন সেনা অফিসার রতিকান্ত বড়ুয়া, কেদার মজুমদার, বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি এবং প্রবীর ঘোষ। কেদার বললেন, বড়ুয়া সাহেব, বিস্ফোরকটা পরীক্ষা করে কী জানলেন?

বড়ুয়া বললেন, জীবনদায়ী ওষুধ পেনিসিলিন বিশুদ্ধ করার কাজে সাফল্য পেয়েছিলেন জার্মানির বৈজ্ঞানিক হ্যানস হেনিং। ইনিই আবার রিসার্চ করে আঠারশো নিরানব্বই সালে এক ধরনের স্বচ্ছ, রাসায়নিক চূর্ণ আবিষ্কার করেন। যার সাহায্যে সাংঘাতিক মাপের বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব।



বিস্ফোরকটা ওই মারুতিতে আছে

এর নাম কি?

এর রাসায়নিক নাম 'সাইক্লোট্রাইমেথিলিন ট্রাইনাট্র্যামিন'। বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তাদের অস্ত্র কারখানায় এর প্রচুর প্রোডাকশন স্টার্ট করে। টি-এন-টি-র বিকল্প হিসাবে যার নামকরণ করা হয় 'সাইক্লোনাইট'।

এর বিশেষত্বটা কি তা হলে?

অসম্ভব নমনীয়তাই এর বিশেষত্ব। রুটি ভাজবার আগে যেমন করে আটা বা ময়দা মাখা হয়, নরম কাদার তালের মতো সেরকম পদার্থ এটি। প্রয়োজনে চারিয়ে নেওয়া যায়। বহন করাও এর জন্য খুব সোজা।

তাহলে আমরা যে পনেরো কিলোগ্রাম এই জিনিসটা উদ্ধার করলাম, এতে কতবড় বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব?

একটা পাঁচ-সাততলা বাড়ি কিংবা একটা আস্ত ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সর্বনাশ! তবে তো আমরা দু'-তিন হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে দিলাম।

বটেই তো! আরো একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি। এই জিনিসটা বিজ্ঞান গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট এক্সপ্লোসিভ' বা সংক্ষেপে আর ডি এক্স।

এটাই তাহলে আর ডি এক্স?—কেদার আর বদ্রীর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।—এই আর ডি এক্স দিয়েই শ্রীলঙ্কার উগ্রপন্থীরা রাজীব গান্ধীকে মেরে দিয়েছিল?

কারেক্ট! এই সেই আর ডি এক্স। উগ্রপন্থী এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানো নাশকতাবাদীদের হাতে উগ্র দেশগুলি এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র তুলে দিচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায়। তারা যে কতবড় খুনী তা আর বলার নয়।

কেদার আর বদ্রীর বুকটা আজ গর্বে ভরে গেল এই ভেবে, যে, পুলিস আর মিলিটারির সঙ্গে যৌথভাবে এতবড় একটা অপারেশনে অংশ নিয়ে তারা সফল হয়েছে।

প্রবীরবাবু বললেন, পনেরো দিন, একমাস যতদিন খুশি আমাদের জেলার বেড়াবার জায়গাগুলো ঘুরে যে-কোন গেস্ট হাউসে থাকুন, আপত্তি নেই।

কেদার বললেন, আপত্তি আবার কিসের? খাওয়া-দাওয়াটা জম্পেশ হলেই হল।

বদ্রী ধমকে বলল, কেদারদা, চুপ করো তো! তোমার শুধু খাওয়া আর খাওয়া!

ধমকাচ্ছিস কেন! সারা জীবন কাজ করে যাব, খাব না? তোর মতো পেটে গামছা বেঁধে বসে থাকতে পারব না।

কেদার আর বদ্রীর ঝগড়া শুনে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন রতিকান্ত বড়ুয়া এবং প্রবীর ঘোষ।

অন্ধকারের হাত



গতরাতেও দেখেছেন। হ্যাঁ, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। মনে হয়েছিলো বাইরে খসখস শব্দ হলো। একটা লম্বা হাত যেন সাঁৎ করে সরে গেল জানালার কাছ থেকে।

অজিতবাবুর কদিন ধরেই এমন মনে হচ্ছে। এটা কি মনের ভুল, না ভূত-টুত কিছু?

কিন্তু কোন যুক্তিতেই অজিতবাবু ব্যাপারটাকে মনের বিভ্রম বলে ভাবতে পারছেন না।

পরদিন অজিত তন্তুবায় সন্ধেবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলেন। সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কাজে মন বসছিলো না। শিল্পী মানুষ তো, আকাশে মেঘ থাকলে মন ভার হয়ে যায়। রাস্তায় চুপচাপ হাঁটছিলেন।

ঠিক তখনই ফের সেই ব্যাপারটা মনে হলো। গতরাতের ঘটনার মতো।

রাস্তার মোড় পেরিয়ে আধো অন্ধকার এই জায়গা। একটা বিরাট বটগাছের ঘন ছায়া পড়েছে। মনে হলো কে যেন তাঁর পেছন পেছন আসছে! একইরকম একটা পায়ের শব্দ ক'দিন ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর আশপাশে। হঠাৎ ফিরে তাকাতেই, সাঁৎ করে একটা ছায়া সরে গেল।

গা ছমছমে ভাবটা ফের ছড়িয়ে পড়লো অজিত তন্তুবায়ের মনের মধ্যে। এবার সেই পায়ের শব্দটা বেশ স্পষ্ট কানে এলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা আরো কাছে চলে এসেছে যেন!

কি করবে অজিত তন্তুবায়? বটগাছের ছায়া এখানে আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে।

হাঁটার গতি বাড়ালেন অজিতবাবু। হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ একবার পেছন ফিরে তাকাতে আতঙ্কে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো তাঁর।

একটা মানুষ। সারা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা। বেশ লম্বা ঢ্যাঙা চেহারা। লোকটা অজিতবাবুকে ধরবার জন্যে তার লম্বা লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন অজিতবাবু। 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে করতে দৌড় লাগালেন সামনের দিকে। এখানে অনেকটা পথই নির্জন। মানুষজন ছিলো না। বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা হার্ডওয়্যারের দোকানের আলো দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এতটা পথ ছুটে এসে প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিলেন সাতচল্লিশ বছর বয়সী অজিত তন্তুবায়।

'কি হলো অজিতদা? চিৎকার করে উঠলেন কেন? দৌড়েই বা এলেন কেন?—দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন।

ভূত! আমাকে ধরতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। লম্বা লম্বা হাত।

কোথায়?

ওই বটগাছটার নিচে।

ঠিক তখনই বটগাছের ওখানটায় একটা মোটর বাইক স্টার্টের এবং চলে যাবার শব্দ শোনা গেল।

দু'জন লোক উল্টোপথ দিয়ে আসছিলো। গাছতলার দিকেই যাবে। দোকানদার বললো,—অজিতদা, এদের সঙ্গে চলে যান। ঐ জায়গাটা নির্জন বটে, তবে কোনদিন ভূত-টুতের কথা শুনিনি।

অজিত তন্তুবায়ের চোখমুখ থেকে তখনো আতঙ্ক কাটেনি। দোকানদারের কথা শুনে বললেন,—হ্যাঁ তাই যাই।

বাড়ির লোক অজিতবাবুর কথা বিশ্বাসই করলো না। অজিতবাবুর বাড়িতে তার ছোট ভাই অজয়, অজিতবাবুর স্ত্রী মিনতিদেবী আর তাদের ছেলে মানস থাকে। মানস ক্লাস টেনে পড়ে। অজয় তন্তুবায়ও শিল্পী। সে-ও তাঁতের শাড়ির ওপর ফুটিয়ে তোলে দারুণ দারুণ নকশা।

অজয় বললো, দাদা কি দেখতে কী দেখেছে—তার ঠিক নেই।

মানস বললো, ভূত বলেই কিছু নেই। বাবা মনে মনে কিছু ভাবছিলো, সে-সবই দেখেছে।

অজিতবাবুর স্ত্রী মিনতিদেবী খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই সব ঘটনায়। তাঁর স্বামী খুবই ভালো মানুষ। ছেলেকে বললেন, মানস, বাবাকে একটু নজরে রাখিস। ক'দিন ধরেই এ-সব কথা বলছে।

রাতে খেতেই পারলেন না অজিত তন্তুবায়। নিজের তাঁতঘরেই ছোট একটা চৌকিতে তিনি রাতে ঘুমোন। সে রাতে চৌকিতে চোখ চেয়ে শুয়ে রইলেন চুপ করে। আকাশ-পাতাল চিন্তা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিলো।

কালো মূর্তিটার লম্বা হাতদুটো অজিতবাবুর চোখে ভাসছে। এক পলক দেখেছিলেন। তারপরই দৌড় দিয়েছিলেন। আঙুলগুলো ছিলো অস্বাভাবিক রকমের বড়। অজিতবাবু আর ভাবতে পারছিলেন না। চোখ বুজে আসছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁতঘরের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

তন্দ্রাঘোরে তাঁর কানে ভেসে আসছিলো নানারকম অস্পষ্ট শব্দ, ফিসফাস কথা বলার আওয়াজ। কে যেন তাঁর আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই লম্বা হাত দুটো মাঝেমাঝেই তাঁর সামনে ভেসে যাচ্ছে।

হাতটা একসময় তাঁর আরো কাছে চলে এলো। লম্বা লম্বা আঙুল। সেই আঙুল দিয়ে অজিত তন্তুবায়ের কপালে হাত রাখলো লোকটা।

হাতের ছোঁয়ায় অজিতবাবুর ঘুমঘোর কেটে গেল। প্রচণ্ড ভয় তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে

বেঁধে ফেললো। কিন্তু চোখ মেলতে ভয় পাচ্ছেন। কি করবেন তিনি? চিৎকার করে উঠবেন? একটা মানুষ যে তাঁর সামনে দাঁড়িযে আছে, এটা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন। এবার সেই হাত তাঁর ডান হাতটা ধরলো। প্রচণ্ড ভয়ে অস্ফুটে চিৎকার করে অজিতবাবু চোখ মেললেন, কে?

কি হলো বাবা? আমি মানস। কি হয়েছে?

অজিতবাবু উঠে বসেছেন বিছানায়। সামনে ছেলে মানস দাঁড়িয়ে। দেখে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তাঁর।—তুই এখানে কি করছিস?

মা পাঠালো। বললো, বাবাকে দেখে আয়, খেলো না কিছু! তাই এলাম।

অনেকক্ষণ এসেছিস?

এই তো এলাম। কিন্তু তুমি ঘুমের মধ্যে অমন ছটফট করছিলে কেন? খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে?

না কিছু না। তুই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

মানস চলে গেল। অজিতবাবু তাঁতঘরে চৌকিতে বহুক্ষণ বসে রইলেন। আর ঘুম আসছিলো না। অনবরত ভাবছিলেন, যা দেখেছি বা যা মনে হচ্ছে, সবই কি মনের ভ্রম?

রাত ক্রমশঃ গভীর হচ্ছিলো। নিশাচর পশুপাখির নানারকম বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছিলো। তারপর কখন যে অজিতবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিজেও জানেন না।

সকাল হলেই সব কিছু অন্যরকম। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই। নেই কোন রহস্য। কিন্তু অজিত তন্তুবায়ের বুকের মধ্যে যেন একটা অশুভ ভাবনা আটকে আছে। তার মধ্যেই তিনি কাজে বসলেন তাঁতঘরে। জাত শিল্পী তিনি। কাজ তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। মনের বিভ্রান্তি দূর করতে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তিনি তাঁত বুনতে লাগলেন। খটাখট শব্দ উঠলো। শাড়ির জমিনে ফুটে উঠছিলো বালুচরীর অপূর্ব কারুকাজ। মন্দির শহর বিষ্ণুপুরে বালুচরীর নকশায় এক নম্বর শিল্পী অজিতবাবু। তাঁর হাতের কাজ দেশ ছেড়ে বিদেশের লোকেরাও লুফে নেয়।

অনেকক্ষণ কাজ করলেন অজিত তন্তুবায়। একেবারে গরিব নন তিনি। খুব ভালো বালুচরীর নকশা করেন। তাই বারো মাসই তাঁর কাজ থাকে। ভাই অজয়ও কাজ করে। সংসার তাই মোটামুটি স্বচ্ছল।

সকালের জলখাবার দিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী মিনতিদেবী। খেয়েদেয়ে আরো খানিকক্ষণ কাজ করে উঠে পড়লেন। তাঁতঘর থেকে বেরিয়ে বড় ঘরে ঢুকে গায়ে জামা গলিয়ে নিলেন। মানসের মা রান্নাঘরে ছিলো। চেঁচিয়ে বললেন,—মানুর মা! আমি একটু কালাচাঁদ যাচ্ছি।

কেন? এই সাত সকালে কি দরকার?

দত্তবাবুর সাথে দেখা করে আসি। অনেক দিন যাইনি।

মিনতিদেবী মনে মনে ভাবলেন, যাক। ওইসব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মনটা হালকা হবে। বুদ্ধি পরামর্শও পাওয়া যাবে।

বিষ্ণুপুর শহরের প্রান্তে যেখানে দলমাদল কামান র'খা আছে, তার পাশে বিখ্যাত কালীবাড়িকে ডাইনে রেখে লাল মোরামের রাস্তা ধরে বাঁ দিকে একটু এগোলেই মল্লরাজাদের অপূর্ব কীর্তি—কালাচাঁদের মন্দির। মন্দির ঘিরে কয়েক বিঘা জমির ওপর অফিসবাড়িটা।

প্রবীর দত্ত অফিসেই ছিলেন। অজিত তন্তুবায়কে দেখেই বললেন, আসুন, আসুন অজিতবাবু। অনেকদিন পরে দেখা হলো। বসুন।

অজিতবাবু বসলেন। প্রবীর দত্ত ফাইলপত্র ঘাঁটছিলেন। দুজনেই চুপচাপ। মিনিট দু'এক নীরবতার পর প্রবীরবাবু ফাইল বন্ধ করতে করতে বললেন,—কি ব্যাপার অজিতবাবু, আপনি তো এমন চুপচাপ থাকেন না! হালচাল বলুন।

প্রচণ্ড চিন্তার মধ্যে আছি।

কি হলো আবার?

ভূত পেছনে লেগেছে।

ধুস! এটা কোন কাজের কথা হলো?

ধুস বলে উড়িয়ে দেবেন না। কাল সন্ধ্যায় বটতলায় ইয়া লম্বা একটা ভূত আমার গলা টিপে ধরেছিলো প্রায়।

তারপর?

আমি ছুটতে ছুটতে বিমলের হার্ডওয়্যারের দোকানে ঢুকে পড়ি।

বটতলায় কি ভূতটাকে আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

হ্যাঁ।

কেমন দেখতে?

খুব লম্বা। হাত দুটোও বেশ লম্বা। অনেকক্ষণ ধরেই পেছনে আওয়াজ পাচ্ছিলাম। বটতলার অন্ধকারে এসে মনে হলো, কেউ ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ভয়ানক! তারপর?

খুব কাছে নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একটা কালো মূর্তি। দুটো লম্বা হাত আমাকে ধরতে চাইছে। আমি আর কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড় লাগাই।

আর কোনো শব্দ টব্দ পাননি?

না। তবে ওদিকে একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গিয়েছিলো।

এত ঘটনা ঘটে গেছে! আমি কিছুই জানি না!

আপনাকে বলতেই এলাম। এর থেকে পরিত্রাণের রাস্তা বাতলে দিন।

প্রবীর দত্ত খানিকটা কৌতুকের সঙ্গেই অজিতবাবুর কথা শুনছিলেন। এবার চেঁচিয়ে ডাকলেন,—শম্ভু। ও শম্ভু!

শম্ভু ছুটে এলো,—কি স্যার?

দু'কাপ চা। ভূত ব্যাটাদের মতলব বুঝতে হবে তো!

খানিকক্ষণ বাদে চা এলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রবীরবাবু বললেন,—দেখুন, এ-ব্যাপারে আপনাকে অকারণ চিন্তা না করতেই বলবো আমি। লেখাপড়া শিখে, চাকরি বাকরি করে, সংসার করে, এই বয়সে এসে আজও পর্যন্ত ভূত-টুতের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। সবই শুনেছি লোকের মুখে। আপনি যে কোন ভূত দেখেননি, একটা ঢ্যাঙা লোককে দেখেছেন—এটা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

কিন্তু ও-রকম কালো লম্বা লম্বা হাত—

সেই ব্যাপারগুলোই বিচার করে দেখতে হবে। কলকাতায় আমার চেনাজানা এক ডিটেকটিভ আছে। তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবো। দেখি, এ-ব্যাপারে সে কি বলে। এবার আপনার কাজকর্মের কথা বলুন।

এই চলছে। নতুন একটা ডিজাইনে হাত দিয়েছি।

আপনার বোনা গোটা দশেক শাড়ি নাকি প্যারিসে গেছে?

হ্যাঁ। ওখানে কি একটা মেলা হবে। সেখানে ইন্ডিয়ার প্যাভেলিয়নে থাকবে।

তা অজিতবাবু, যাই বলুন, আপনি অবশ্যই এখন আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী। মাকড়া পাথর আর টেরাকোটার মন্দির-শহর বিষ্ণুপুর এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে জায়গা পেয়েছে আপনাদের মতো শিল্পীর দৌলতে।

সেদিন দুপুরের পর থেকেই আকাশ ঢেকে গেল কালো মেঘে। বিষ্ণুপুর ছোট শহর। রাস্তাঘাটের অবস্থাও তেমন ভালো নয়। বিকেলে যখন প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো, শহরের রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। এত জল জমে গেল বিভিন্ন জায়গায় যে, রিকশাওয়ালাদের বাড়ি চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইলো না।

তাঁতীপাড়াতেও আজকে তেমন একটা তাঁতের খটাখট শব্দ নেই। বৃষ্টিবাদলার দিনে তাঁত বড্ড ভারী হয়ে ওঠে। তার চেয়েও বড় কথা, যাঁরা বালুচরীর নকশা তোলে শাড়িতে, তাঁরা তো শিল্পী। শিল্পীদের মুডের ব্যাপার থাকে। এমন বাদলা দিনে কাজে মন বসছিলো না কোন তাঁতীর। তার ওপর বিদ্যুৎ চলে গেল হঠাৎ।

অজিত তন্তুবায় রান্নাঘরে বসে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। স্ত্রী মিনতিদেবী ভাত-তরকারি বেড়ে দিয়েছেন। ভাই অজয় আর ছেলে মানসও খেতে বসেছে।

মিনতিদেবী জিজ্ঞেস করলেন,—কি গো, সকালে যে কালাচাঁদ গেলে, প্রবীরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?

হ্যাঁ, অনেক কথাবার্তাও হলো। আমার বোনা শাড়ি বিদেশে গেছে শুনেছেন। খুব খুশি হয়েছেন। লাউঘণ্ট দাও আর একটু! খুব ভালো হয়েছে।

মিনতিদেবী বুঝলেন, মানসের বাবার মন আজ ভালো আছে। কাল রাতে খেতে পারেননি। আজ চেয়ে খাচ্ছেন।

স্বামীর পাতে লাউঘণ্ট দিয়ে অজয়কে বললেন,—ঠাকুরপো, তোমাকে একটু লাউঘণ্ট দিই?

দাও বৌদি। সত্যিই দারুণ হয়েছে!

লোডশেডিং থাকাতে হ্যারিকেন জ্বেলে খাওয়াদাওয়া সারতে হলো। মানস বললো,—দেখবে, এত বৃষ্টিতে সারা রাতে আর কারেন্ট আসবে না।

তাই তো মনে হচ্ছে।

দুই

রাস্তার দু'পাশে ঘন বন। বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে। এটা জয়পুরের বন। এই রাস্তা কলকাতা থেকে তারকেশ্বর, আরামবাগ, জয়রামবাটি, জয়পুর, বিষ্ণুপুর হয়ে বাঁকুড়া শহরের দিকে চলে গেছে।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিস্নাত পাকা রাস্তা ধরে কালো রঙের একটা জিপ এগিয়ে যাচ্ছিলো জয়পুরের দিক থেকে বিষ্ণুপুর শহরের দিকে।

ঢাকা জিপ। ড্রাইভার বেশ মোটাসোটা, গালগুলো ফোলাফোলা, ভুঁড়িটা যেন স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে লেগে যাবে। চোখদুটো কুতকুতে হলেও লোকটার দৃষ্টিশক্তি প্রখর। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে বেঁটেমতো একটা লোক। হাত-পা'গুলো পাকানো দড়ির মতো মাস্‌লসর্বস্ব। এ যে অসম্ভব শক্তি রাখে, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। পেছনের ঢাকা অংশে আরো তিনটে লোক বসে আছে। তিনজনই বেশ লম্বা। স্বাস্থ্যবান। গাড়ি চলছিলো। কেউ কোন কথা বলছিলো না। পেছনের একজন অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলো। অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বললো,—কিরে লোলো, তোর গাড়ি কি এর থেকে জোরে চলবে না? গোরুর গাড়িও এর থেকে বেশি স্পিডে চলে।

কোনো উপায় নেই ওস্তাদ। দেকচো না বিষ্টির অবস্তা! চাকা স্লিপ করলে একদম সাইড হয়ে যাবো।

ঠিক আছে। তুই যা বলবি, এখন তাই শুনতে হবে।

তবুও ড্রাইভার লোলো এবার জিপের গতি একটু বাড়ালো। গাড়ির হেডলাইটের আলো অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর বলয় তৈরি করেছে। বিষ্ণুপুর শহর অন্ধকারের আবর্তে মুষলধারার বৃষ্টিকে নিয়ে ঘুমকাতুরে শিশুর মতো চুপচাপ গড়াগড়ি খাচ্ছে।

হাইওয়ে থেকে ঢাকা জিপ শহরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। গতি কমিয়ে বিষ্ণুপুর শহরের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগোচ্ছে সেটা।

গাড়ির ভেতরের লোকগুলো এবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পেছনে বসে থাকা সেই লোকটা জিজ্ঞেস করলো—লোলো, আর কতক্ষণের রাস্তা?

পাঁচ থেকে সাত মিনিট।

এসে গেছি তাহলে! খায়রুল, ধনিয়া, আর পাটোয়ারী বাইরে থাকবি। আমি একা ভেতরে ঢুকবো।

কে কোথায় থাকবো?

ধনিয়া রাস্তায় গাড়ির কাছে। খায়রুল বাড়ির গেটের সামনে আর পাটোয়ারী আমাকে একটু দূর থেকে ফলো করবি।...লোলো, আর কত দূর?

এসে গেছি।—বলেই ড্রাইভার জিপ দাঁড় করালো। জায়গাটা শহরের তাঁতীপাড়া।

জিপ এবং জিপের ভেতরের মানুষগুলো মিনিট পাঁচেক নিশ্চুপ হয়ে রইলো। আশপাশে কোন লোকজন আছে কিনা বোঝার জন্যে। এলাকার একটি বাড়ি থেকেও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত মানুষ বোধহয় ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

জিপের ভেতরের লোকগুলো ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে। ধনিয়ার হাতে পাইপগান উঠে এলো। খায়রুলের হাতে একটা দিশি বন্দুক। পাটোয়ারীর হাতে পিস্তল। যে লোকটা হুকুম দিচ্ছিলো, তার খালি হাত। সে যখন জিপ থেকে নামলো, বোঝা গেল, অস্বাভাবিক লম্বা সে। দুটো হাত ঝুলিয়ে রাখলে হাঁটু ছাড়িয়ে যায়। সবার গায়েই কালো বর্ষাতি। লম্বা লোকটা অজিত তন্তুবায়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনে পাটোয়ারী। খায়রুলও চলে এসেছে। ওদের লিডার ততক্ষণে বাড়ির গেটের হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। পাটোয়ারীও ঢুকলো। গাড়ির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ধনিয়া।

ওদের সব কিছুই চেনা মনে হচ্ছে। লম্বা লোকটা তাঁতঘরের দিকেই গেলো। পাটোয়ারী হাতের দিশি পিস্তলটা উঁচিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে শিকারী বিড়ালের মতো চারধার দেখছিলো।

অজিত তন্তুবায় আজকে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই ঘুমিয়েছেন। রাতের খাওয়া

তাড়াতাড়িই হয়ে গিয়েছিলো। তাঁতঘরে এসে নিজের বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হলো, ক'দিন ধরে অস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে আসা সেই পায়ের শব্দগুলো যেন ফের তাঁর চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। ফিস ফিস করে কারা যেন কথা বলছে।

একটা লোক তাঁতঘরের ভেতর ঢুকেছে—এটা বুঝতে পারছিলেন অজিতবাবু। তাঁর ঘুম পাতলা হয়ে যাচ্ছিলো।

লম্বা লোকটা এবার এগিয়ে গেলো বিছানার দিকে। আগেই সে ঘরের দরজা খুলে ফেলেছিল।

অজিতবাবু চোখ মেললেন। অন্ধকার সয়ে যেতে চল্লিশ পঞ্চাশ সেকেন্ড লেগে গেলো।...সেই ছায়ামূর্তি! দেখেই অস্ফুটে চিৎকার করে উঠলেন।

বিছানার কাছে ছুটে এলো লোকটা। লম্বা হাত বাড়িয়ে অজিত তন্তুবায়ের মুখ চেপে ধরলো। অজিতবাবু গোঁ গোঁ করছিলেন। লম্বা লোকটার সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেলো। লোকটা ডাকলো,—পায়োটারী!

অজিতবাবুর কানে গেলো ডাকটা।

পাটোয়ারী ছুটে এলো। দুজনে মিলে কব্জা করে ফেললো অজিত তন্তুবায়কে। চৌকি থেকে হিঁচড়ে মেঝেয় নামানো হলো তাঁকে। লম্বা লোকটা পকেট থেকে একটা কাপড়ের টুকরো বের করলো। লোকটা যখন কাপড়ের টুকরো দিয়ে অজিত তন্তুবায়ের মুখ বেঁধে ফেলছিলো, পাটোয়ারী তখন ধরে রেখেছিলো তাঁকে। মুখ বেঁধে ওরা অজিতবাবুকে উপুর করে দিলো। এই ফাঁকে ডানহাতের তর্জনির নখ দিয়ে ভেজা মাটির মেঝেতে আঁচড় কেটে কিছু লিখে ফেললেন অজিতবাবু।

ঢ্যাঙা লম্বা লোকটা আর পাটোয়ারী দুজনে মিলে অজিতবাবুকে চ্যাংচোলা করে নিয়ে জিপের পিছনের সিটে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো। পাইপগান তাতে ধনিয়া, আর বন্দুক হাতে খায়রুল চারধারে নজর রাখছিলো।

একে একে জিপে উঠে পড়লো সবাই। লোলো গিয়ার মেরে গাড়ি স্টার্ট করে দিলো। বৃষ্টিভেজা বিষ্ণুপুর শহরের পথ ছেড়ে গাড়ি কলকাতামুখী হাইওয়ে ধরে জয়পুরের দিকে ছুটলো।

জিপের মধ্যে মুখ বাঁধা অবস্থায় বসে থাকা অজিত তন্তুবায় ভাবছিলেন, এরা কারা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে!

নদীর পাড়েই শ্মশান। শ্মশানে একটা বড় বটগাছ। বটগাছের নিচে শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটা পাকা চালাঘর। ওপরে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। আজ শ্মশানে

কোন শবযাত্রী নেই। বৃষ্টি কাদায় ছন্নছাড়া অবস্থা। তবুও দেখা গেল চালাঘরে দুজন লোক কম্বল গায়ে দিয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। একজন বললো,—কি রে প্যাংলা, কোন খবরই নেই দেখছি।

বুঝতে পারছি না! ফেঁসে গেল না তো?

তবে বিষ্টি-বাদলার দিন, সময়ও লাগতে পারে।

বসে থাকি। আমাদের আর কি! আর তো কোন কাজকম্মো নেই।

কাজ নেই কি রে! গুরুদেবের দিকে নজর রাখতে হবে না! কে পাহারা দেবে? চল্, একবার দেখে আসি।

দুজনেই উঠে পড়লো। চাতালের পেছন দিকে চলে গেলো ওরা। সেখানে বটগাছ থেকে একটা বড়সড় ঝুরি নেমেছে। সেই ঝুরিকে পেছনে রেখে একটা মন্দির। মন্দিরের ভেতরে এক ভয়ঙ্কর নারীমূর্তি। মূর্তির সামনে একটা পিলসূজের ওপর মাটির প্রদীপ জ্বলছে। মূর্তির দুটো পায়ে মোটা করে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়েছে। খালি গা, দশাসই চেহারার একটা মানুষ মূর্তির দিকে মুখ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে। সব মিলে হঠাৎ করে কেউ এই দৃশ্য দেখলে নির্ঘাত ভয় পেয়ে যাবে।

মূর্তির সামনে যে লোকটি চোখ বুজে বসেছিলো, তার মুখে প্রদীপের আলো পড়ে ভয়ঙ্কর লাগছিলো। পরিবেশ একেবারে থমথমে।

কোথায় একটা কুকুর হঠাৎই ডেকে উঠলো ঘেউঘেউ করে।

চমকে উঠলো প্যাংলা। পাশের সঙ্গীর হাত চেপে ধরে বললো,—ওরে বাবা রে! কে রে?

ভয় পাওয়ার কি আছে? দেখছিস না, কুকুর ডাকছে।

ওদের কথাবার্তা শুনে নড়েচড়ে উঠলো সেই ধ্যানস্থ লোকটা। হেঁড়ে গলায় বললো,—অ্যাই ভূতো! চেঁচাচ্ছিস কেন? তোদের বলেছিলাম না, ডাকিনী পুজোয় বসছি। আমাকে বিব্রত করবি না।

না গামাবাবু। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি।

আমার নাম গামাপ্রসাদ তিওয়ারী। আমাকে যা বোঝাবি, তাই বুঝব? মহাশ্মশানে তোদের রেখেছি সাধনাগৃহের দ্বারী হিসেবে। আর তোরা কিনা ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিস। আবার ধ্যানেও ব্যাঘাত ঘটিয়ে দিলি।

ভূতো আর প্যাংলা মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো।

গামাপ্রসাদ উঠে পড়লো ডাকিনী পুজোর আসন ছেড়ে। এবার বোঝা গেল, তার চেহারাটা সত্যিই বিরাট। সাদা ধুতি আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরনে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তার হেঁড়ে গলা শ্মশানের নৈঃশব্দ্য ভেঙে দিলো।

ওদের খবর কি?

এখনো কোন খবর নেই।

যত্তো সব অপোগণ্ডের দল! একটা নেংটি ইঁদুর তুলতে পনেরো দিন লাগিয়ে দিলো! অ্যাতো আটঘাট বেঁধে বেরিয়েও অ্যাতো দেরি!

তক্ষুনি দূর থেকে ভেসে এলো গাড়ির যান্ত্রিক আওয়াজ। প্যাংলা ঝটিতি বললো,—ওই আসছে।

দাঁড়া! চুপ করে দাঁড়া। পুলিসের গাড়িও তো হতে পারে! তেমন কিছু হলে আমি পুজোয় বসে যাবো।

ওরা দুজন ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। ভূতো বললো,—গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে।

নে। চেপে যা।

এরা সবাই চুপ করে গেলো। মন্দিরের ভেতর বাতাসে কাঁপতে থাকা প্রদীপের আলোয় সেই ভয়ঙ্কর ডাকিনীমূর্তিকে আরো বীভৎস লাগছিলো। মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে প্রদীপের এক চিলতে কাঁপা কাঁপা আলো বাইরে এসে পড়েছে। পরিবেশটা ভূতুড়ে, অলৌকিক এবং ভীতিজনক।

মোটর গাড়ির যান্ত্রিক শব্দ খানিকটা এগিয়ে এসে থেমে গেলো। সেই সঙ্গে গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো। ভূতো আর প্যাংলা ঝট করে মন্দিরের পেছনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছিলো। ওরা সতর্ক হয়ে লক্ষ্য করছিলো কে আসছে!

প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় মন্দিরের সামনের চত্বরে প্রথমে লোকটার পা দুটো দেখা গেলো। তারপর পুরো শরীরটা।

গামাবাবু, পাখি খাঁচায়।

আধ মিনিট পেরিয়ে যাবার পর গামাপ্রসাদ ঘুরে তাকালো,—কে? পুজোর সময় বিঘ্ন ঘটায়?

ফের একই উত্তর পাওয়া গেল,—গামাবাবু, পাখি খাঁচায়।

কে?

আমি ধনিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই গামাপ্রসাদ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো,—খবর কি?

খবর ভালো।

এ কথা শুনে গামাপ্রসাদের লম্বা-চওড়া মুখটায় কুটিল হাসি খেলে গেলো। বললো,—বহুৎ আচ্ছা। সব কোথায়?

বড় রাস্তায়। গাড়ির ভেতরে। আর দেরি করা যাবে না। এক্ষুণি চলে যাওয়াই ভালো। এ জায়গাটা সুবিধের নয়।

হুঁ। —বলে গামাপ্রসাদ ডাকলো ঃ অ্যাই ভূতো, প্যাংলা, বেরিয়ে আয়!

গামাপ্রসাদ মন্দিরের ভেতর থেকে চত্বরে পা রাখলো।

চারজনই বড় বড় পা ফেলে পাকা রাস্তার দিকে হাঁটা দিলো।

সেই ঢাকা জিপ গায়ে অন্ধকার মেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যাওয়ামাত্র নেমে এলো পাটোয়ারী। বললো, গামাবাবু, আপনি এখানে বসুন। আমি পেছনে বসছি।

গামাপ্রসাদ তেওয়ারী তার দশাসই চেহারা নিয়ে উঠে পড়লো জিপে। উঠে দেখে নিলো, মুখ বাঁধা অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়েছে অজিত তন্তুবায়কে।

ড্রাইভার লোলো নিচে নেমে জিপের পেছন দিকে চলে গেলো। চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললো দরজা। পেছনে খুপরিমতো জায়গায় এবার উঠে পড়লো পাটোয়ারী, প্যাংলা আর ভূতো। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

একটা জলজ্যান্ত মানুষকে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে একদল অপরাধী অপহরণ করে নিয়ে চলে গেলো দুর্যোগের রাতে। কেউ টের পেলো না।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থেকে একটা টেলিফোন গেল কলকাতার বড় এক হোটেলে। টেলিফোনের মূল বক্তব্য ছিলো,—মিস্টার শর্মা, আমাদের প্রথম দফার কাজ কমপ্লিট। মাল কিভাবে দেওয়া হবে, টাকা-পয়সার লেনদেন কিভাবে হবে, সে ব্যাপারে কলকাতা গিয়ে কথা বলবো। মাল বেশিক্ষণ হাতে রাখা যাবে না। এমনিতেই ডিস্টার্বড এরিয়া। পুলিস খুবই অ্যাকটিভ। আমি আজ দুপুরে রওনা দিচ্ছি। সন্ধেয় দেখা হবে। কথাও হবে।

তিন

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে গোয়েন্দা কেদার মজুমদার ও তাঁর সহকারী বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি তাঁদের অফিস উদিতভানু ইনফরমেশনে রিল্যাক্স মুডেই সময় কাটাচ্ছিলেন। ওঁদের ক্যারাটে ক্লাবের দারোয়ান দিলানন্দ সিং দুটো বড় ঠোঙা নিয়ে হাজির হলো,—জী সাহাব, আপোনাদের মুড়ি, তেলিয়াভাজা। গরহম বেগুইনি, আলু চপ আউর ভি দালবড়া।

একসেলেন্ট! এবার টেবিলে খবরের কাগজটা পাতো। মুড়িগুলো ঢালো। কাঁচা পেঁয়াজ এনেছো?

হাঁ জী। দোঠো বড়িয়া।

বদ্রীনারায়ণ চেয়ার থেকে উঠে তাড়াতাড়ি করে ফ্যানের সুইচ অফ করে দিলো। বললো,—আমাদের দিলানন্দ যা কীর্তিমান! ফ্যান চালানো অবস্থাতেই মুড়ি ঢেলে দিতো টেবিলে। উড়ে উড়ে মুড়ি খেতে হতো।

কেদার মুখে হাল্কা হাসি ফুটিয়ে দিলানন্দকে বললেন,—এখন তুমি একটা বেগুনি, একটা আলুর চপ এবং একখানা ডালবড়া ও বেশ খানিকটা মুড়ি তোমার জন্য ঠোঙায় রেখে বাদবাকি আমাদের দিয়ে যাও।

জী।

আর শোনো। গোপালদার চায়ের দোকানে বড় গ্লাসের দু'গ্লাস লেমন টি বলে এসো।

দিলানন্দ দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল, ঠিক তখনই টেলিফোন বাজলো।

কেদারই টেলিফোন ধরলেন,—হ্যাঁ। উদিতভানু ইনফরমেশন।

কেদার মজুমদার আছেন নাকি?

বলছি।

আমাকে চিনতে পারছেন? আমি প্রবীর দত্ত বলছি।

পুরুলিয়া থেকে?

না, না। বিষ্ণুপুর আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া থেকে। মনে আছে? বিষ্ণুপুর মেলায় আপনার সাথে আলাপ হয়েছিলো!

ও! আচ্ছা আচ্ছা! মনে পড়েছে। আপনি গাড়ি করে আমাদের সব টেরাকোটার মন্দিরগুলো দেখালেন।

হ্যাঁ। আমি সেই প্রবীর দত্ত। জরুরি দরকারে ফোন করছি। আপনাকে একবার আসতে হবে।

কেন?

ফোনে এত কথা বলা যাবে না। শুধু এটুকু বলছি, বিষ্ণুপুরের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বালুচরী শাড়ির শিল্পী গত রাতে নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা, গতকালই উনি আমার কাছে এসেছিলেন। কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন। আমি এখনো পুলিসকে কিছু বলিনি। আপনার পরামর্শ চাইছি। খুব অসুবিধে না থাকলে কালকেই চলে আসুন।

বিকেলবেলাই ধর্মতলা থেকে সি এস টি সি-র কলকাতা-বিষ্ণুপুর বাসে উঠে পড়লো কেদার বদ্রী জুটি। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ওরা পৌঁছে গেলো বিষ্ণুপুর। সেখান থেকে কেদার ফোন করলেন এ এস আই অফিসে। ফোন পেয়ে প্রবীর দত্ত বললেন,—দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের জন্য

আমাদের অফিসের গেস্ট রুম মজুত আছে।

সেই রাতে কেদার-বদ্রীর সঙ্গে প্রবীর দত্তের বহুক্ষণ কথা হলো। গভীর রাতে শোবার সময় কেদার জিজ্ঞেস করলেন,—বদ্রী, শুধুই তো ধোঁয়াশা। এগোবো কি করে?

অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হচ্ছে। তবু আবছা হলেও দুটো সূত্র ধরে এগোতে হবে। এক, একটা লম্বা ঢ্যাঙা লোক, দুই, তার হাতদুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়।

কিন্তু এরকম একজন ছাপোষা নিরীহ মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে মোটিভ কি থাকতে পারে?

অজিত তন্তুবায় নিজেই তো নিজের মোটিভ।

তুই কি লোকটার শিল্প-গুণের কথা বলতে চাইছিস?

সেরকমই মনে করছি।

পরের দিন সকাল সাতটার মধ্যেই প্রবীর দত্ত কেদার-বদ্রীকে নিয়ে বিষ্ণুপুর তাঁতীপাড়ায় অজিত তন্তুবায়ের বাড়িতে এলেন।

প্রবীরবাবুর ডাক শুনে অজিতবাবুর ভাই অজয় তন্তুবায় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।

আসুন প্রবীরবাবু।

ততক্ষণে মানসও বেরিয়ে এসেছে। বদ্রীর চোখ পড়লো মানসের দিকে। বদ্রী মানসকে একনজর দেখেই বুঝলো,—ছেলেটি বুদ্ধিমান। মনে হয় কাজে লাগবে।

ওরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। প্রবীর দত্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের।

আমি যে ডিটেকটিভ কেদারবাবুর কথা বলেছিলাম কালকে, এই যে তিনি। আর এ-হচ্ছে বদ্রীনারায়ণ। কেদারবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট।...কেদারবাবু, ইনি হচ্ছেন অজিতবাবুর ভাই অজয়। আর ও হলো অজিতবাবুর ছেলে মানস।

নমস্কার। আসুন। ঘরে আসুন।

অজয় তন্তুবায় বাইরের ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে দিলো। ওরা বসলো সেখানে। কেদার বললেন,—দেখুন, বসে সময় নষ্ট করতে চাইছি না। ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়েছেন একদিন দু'রাত হয়ে গেলো। যত দেরি করবো, ততই লিঙ্কগুলো হারাতে থাকবে।—হ্যাঁ। সেই রাতে অজিতবাবু কোথায় ঘুমিয়েছিলেন? সেই জায়গাটা আমরা একটু দেখবো।

মাটির ঘর। টালির চাল। নেহাত ছোট নয় তাঁতঘরটা। ভেতরে দুখানা তাঁত রয়েছে। ফাঁকা জায়গা অনেকটা। চারটি বড় বড় জানালা তাঁতদুটোর সোজাসুজি। কাজের সময় যাতে প্রচুর আলো পাওয়া যায়। ঘরের অপর পাশে শোবার চৌকি।

চৌকির ওপর শেতলপাটি বিছানো। তার ওপর একটা কাঁথা। বিছানায় একটা আধময়লা সাদা চাদর দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে। বদ্রীনারায়ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো সবকিছু। কেদার জিজ্ঞেস করলেন,—দুটো তাঁত কেন?

একটায় দাদা কাপড় বোনে। একটায় আমি।—অজয় বললো।

আচ্ছা, কাল থেকে আজ অবধি কোন জিনিস কি এ ঘর থেকে সরানো হয়েছে?

না। থানা থেকে পুলিস এসে সব ঘেঁটে-ঘুঁটে দেখে গেছে। ওরা জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে গিয়েছিলো।

বদ্রী তাঁতের কাছে গিয়ে কিছু খুঁজছিলো। ওখান থেকে জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখলো অনেকক্ষণ। ফের সরে এলো আগের জায়গায়।

তাঁতীপাড়া জেগে উঠেছে। পাশাপাশি বাড়িগুলো থেকে খটাখট শব্দ ভেসে আসছে। কাপড় বোনা হচ্ছে।

বদ্রীনারায়ণ মাটির মেঝের দিকে চোখ রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো। পরশু রাতের বৃষ্টি মাটির মেঝে স্যাঁতসেতে করে দিলেও, গতকালের শুকনো আবহাওয়ায় মেঝেতে খানিকটা টান ধরেছে। অনেকেরই পায়ের ছাপ দেখলো বদ্রীনারায়ণ। উবু হয়ে বসে তার মধ্যে থেকে অন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় কি না, তাই দেখছিল।

কেদার অজয়কে জিজ্ঞেস করলেন,—কাল সকালে কখন ব্যাপারটা নজরে পড়লো?

সাতটা নাগাদ। দাদা ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়ে। কাল সাতটাতেও উঠছে না দেখে মানসই প্রথম তাঁতঘরে এসে দেখে, দাদা নেই।

আচ্ছা, অজিতবাবু তো নিজে নিজেই কোথাও চলে যেতে পারেন?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু ক'দিন ধরে দাদাকে কেউ লক্ষ্য রাখছিলো—এটা দাদা রোজই বলতো।

আচ্ছা মানস, গতকাল সকালে এই ঘরে ঢুকে যা যা যেমনভাবে দেখেছিলে, চোখ বুজে একবার ভাবো তো! তারপর ঠিক ঠিক করে বলো আমাদের।

মানস মিনিটখানেক চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলো।

আমি বাইরে থেকে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডেকে দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা হাট করে খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি বাবা নেই। শেতলপাটি আর কাঁথা আদ্দেকটা মাটিতে, আদ্দেকটা চৌকিতে। কাঁথাটা দুমড়ে মুচড়ে ছিলো। গায়ে দেওয়ার ওই চাদরটা মাটিতে পড়ে ছিলো।

আর জানালাগুলো?

জানালা খোলাই ছিলো।

কেদার আর বদ্রী এবার চৌকির কাছে গিয়ে শীতলপাটি, কাঁথা আর দোমড়ানো চাদরটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। সবাই চুপ। কেউ কোনো কথা বলছে না।

বদ্রী বললো,—অজিতবাবু নিজে কোথাও যাননি। টেনে হিঁচড়েই নামানো হয়েছিলো তাঁকে। কাঁথায় মাটি লেগে আছে।

বদ্রীনারায়ণ এবার দুমড়ে মুচড়ে রাখা সাদা চাদরটা হাত দিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো। আধময়লা তেলচিটে চাদর। চাদরের এখানে সেখানে বেশ মাটি লেগেছে। চাদরটা ঠিক যেখানে রাখা ছিলো, বদ্রী সেই জায়গাটা নিচু হয়ে খুব ভালো করে দেখতে গিয়েই তার চোখ আটকে গেল। অনেকের হাঁটাচলার ফলে আঁচড়গুলো মিশে যাবার উপক্রম হলেও মাথা নামিয়ে বদ্রী দেখে নিলো কয়েকটি শব্দ। —আমাকে ভূত নয় পাটোয়ারী নামের লো—

বদ্রীনারায়ণ ওখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। কেদার খেয়াল করলেন সেটা। বুঝলেন, কিছু একটা বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু এখন কাউকে তা বলবে না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা অজিত তন্তুবায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। সেখান থেকে গেলো বিষ্ণুপুর পুলিস স্টেশনে। বিষ্ণুপুর বাজারের কাছে শিবদাস গার্লস স্কুলের কাছেই থানা। পোস্ট অফিসও ওখানে।

প্রবীর দত্ত থানার অফিসার ইনচার্জ দীনেন সান্যালের সঙ্গে কেদার-বদ্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বদ্রী কোন ব্যাপারেই দেরি করতে চাইছিলো না। সান্যালবাবু চা বিস্কুট আনতে পাঠালেন। সেই ফাঁকে বদ্রী বললো,—দীনেনবাবু, আপনার কাছ থেকে দুটো ব্যাপারে কোয়্যারি করতে চাই।

কি বলো তো?

এক, পাটোয়ারী নামে কোনো গুণ্ডা বদমাইশ এই এলাকা বা কাছাকাছি এলাকাগুলোর মধ্যে আছে কি না।

দু'নম্বর?

দু'নম্বর হচ্ছে, একটা লম্বা লোক, অপরাধ জগতের সাথে যুক্ত, তার হাতদুটো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা এমন কারোর কথা জানা আছে কিনা।

এখনই মনে পড়ছে না। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

কেদার বললেন,—দীনেনবাবু, আপনারা তো অজিত তন্তুবায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁতঘরটা দেখে এসেছেন। সন্দেহজনক তেমন কিছু নজরে পড়েছিলো?

না। আমাদের ধারণা, ভদ্রলোক নিজেনিজেই চলে গেছেন। বাড়ির লোকজনের কথা শুনে মনে হলো উনি বেশ কিছুদিন ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।

দীনেনবাবু, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অজিতবাবুকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে। আপনি আপাতত ঐ দুটো ব্যাপারে খোঁজ নিন। —কেদার বললেন।

আজকেই খোঁজ পাঠাচ্ছি।

এ এস আই, অর্থাৎ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিষ্ণুপুর অফিসের গেস্ট রুমে বসে কেদার, বদ্রীনারায়ণ আর প্রবীরবাবু কথা বলছিলেন।

থানা খুব একটা ইনিসিয়েটিভ নেবে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা ধরেই নিয়েছে অজিতবাবু নিজেই চলে গেছেন।

না। অজিতবাবুকে কিডন্যাপই করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।—বদ্রী বললো।

ব্যাপারটা সন্দেহজনক ঠেকেছে বলেই আমি আপনাদের এখানে আসতে বললাম। কেননা বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির একটা ভালো বাজার বিদেশেও তৈরি হয়ে গেছে। গত বছর কুড়ি ধরে এ রাজ্যের গ্রামীণ পরিবেশে স্বস্তি থাকায় গ্রামীণ শিল্পগুলো যে ফ্লারিশ করেছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। তাঁতীরা সরকারি সহযোগিতা পাওয়ায়, আর বিষ্ণুপুর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে জায়গা করে নেওয়ায় ধান্দাবাজরা কিন্তু নড়েচড়ে বসেছে। এটা আমি বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছি। —বললেন প্রবীর দত্ত।

কিন্তু তার সঙ্গে অজিতবাবুর নিখোঁজ হওয়ায় কী সম্পর্ক?

সাদা চোখে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু অজিত তন্তুবায় বালুচরী নকশার ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট কারিগর। তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে কোটি কোটি টাকা কামানো যায়।

প্রবীরবাবুর এই কথার সূত্র ধরে বদ্রী বললো,—কেদারদা, এই অনুমানটুকু সামনে রেখেই এগোনো যাক।

চার

কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে, যেখানে এম এল এ হোস্টেল আর স্টেট গেস্ট হাউস, সেই রাস্তাতেই একটা হোটেলে চারতলার একটি রুমে দেখা গেলো গামাপ্রসাদ তেওয়ারীকে।

সোফায় বসেছিলো তেওয়ারী। পরনে গাঢ় হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর ধবধবে সাদা টেরিকটের চোস্তাই পাজামা। উল্টোদিকের সোফায় প্রায় সাহেবদেরই মতো ফর্সা সাহেবী পোশাক পরা একজন বসে। গামাপ্রসাদ তাকে মিস্টার শর্মা বলে

ডাকছিলো।

গামাপ্রসাদ শর্মাকে বললো,—দেখুন, আমাদের ওখানে যা পরিস্থিতি, কাউকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখার স্কোপ নেই। ওখানকার মানুষজন এখন সাঙঘাতিক অ্যালার্ট।

ঠিক আছে। আমি সিঙ্গাপুরে ঘণ্টাখানেক বাদে ফোন করবো। এখন আপনি দাম বলুন।

এ দারুণ রিস্কি গেম। দশের নিচে পারা যাবে না।

দশ লাখ! পাগল আছেন? একটা তাঁতী? তার দাম দশ লাখ!

পাগল বলায় গামাপ্রসাদ মনে মনে খেপলেও মুখে কিছু বললো না। বললো,—ওই তাঁতীর হাতের কাজ তো আপনারা কোটি কোটি ডলারে বিক্রি করবেন। একবার সিঙ্গাপুরে মালটাকে নিয়ে তুলতে পারলেই আপনাদের পোয়া বারো। তখন আর আপনাদের গামাপ্রসাদের কথা মনে থাকবে না।

হো-হো করে হেসে উঠলো শর্মা। বললো,—ব্যাপারটা যতো সহজে বললেন, ততো সহজ নয়। এটা একটা নতুন প্রজেক্ট। কিউরিও বা সেই জাতীয় অন্যান্য জিনিস বিক্রির সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্ব শেষ। এক্ষেত্রে এটা একটা ক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট। লোকটাকে দিয়ে কাজ করাতে হবে।

লোকটার ওপর জোর খাটাতে গেলে যদি বেগড়বাই করে, কাজ না করতে চায়—তা হলে?

লোকটা জাত শিল্পী। কাজ পাগল। অনেক ভেবে একে চুজ করেছি। স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে ও আনন্দে কাজ করবে।

লোকটা তো অসুখে বা যে কোন কারণে পুট করে মরেও যেতে পারে। তা হলে তো সবটা টাকাই জলে গেল।

অবান্তর কথা। যে কোন মানুষই তো যখন তখন মরে যেতে পারে, তা বলে কি কোন কাজ বন্ধ থাকছে?

শর্মা বুঝলো, গামাপ্রসাদ বড় ঘোড়েল লোক। হেসে বললো,—লাঞ্চ-টাঞ্চ করুন। সিঙ্গাপুরের সাথে কথা বলি। দেখি, ওরা কত দিতে পারে।

টেলিফোন বাজলো। প্রবীর দত্ত টেলিফোন তুললেন—হ্যালো। এ এস আই বিষ্ণুপুর।

আমি বিষ্ণুপুর থানা থেকে ও সি দীনেন সান্যাল বলছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন দীনেনবাবু। আমি প্রবীর দত্ত।

কেদারবাবু আছেন নাকি?



মল্লরাজাদের অপূর্ব কীর্তি কালাচাঁদের মন্দির

আছেন। ডেকে দেবো?

হ্যাঁ, দিন। ওনারা যখন তদন্ত চালাচ্ছেন, যেটুকু ইনফরমেশন পাবো, জানিয়ে দেবো।

প্রবীরবাবু কেদার মজুমদারকে ডেকে দিলেন। বদ্রীনারায়ণও সঙ্গে এলো। রিসিভার তুলে কেদার বললেন,—বলুন দীনেনবাবু, আমরা সবাই হাজির এখানে।

পাটোয়ারী নামের এক দাগী অপরাধীর খোঁজ পাওয়া গেছে। গড়বেতা থানা এই ইনফরমেশনটা দিলো। ক্রিমিনাল, তবে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছে। এক নজরে দেখলে ভদ্র ছেলেই মনে হবে। পুলিস রেকর্ডে পাটোয়ারীর ছবিও আছে।

বাঃ। অনেক খবর পাওয়া গেলো। লম্বা, ঢ্যাঙা লোকটা সম্পর্কে কিছু জানা গেল?

এখনো জানা যায়নি। আপাতত ছাড়ি। আপনারা কাজ চালিয়ে যান।

কেদার ফোন রেখে প্রবীর দত্তকে বললেন,—আমরা একটু বিষ্ণুপুর থানায় যাবো। সেখান থেকে গড়বেতা। আপনি এখানেই থাকুন। টেলিফোনে যোগাযোগ করবো।

বদ্রী বললো,—কেদারদা, আমার মন বলছে, নখের আঁচড়ে অজিত তন্তুবায় আমাদের ক্লু দিয়ে গেছেন। সেই পথেই এগোতে হবে।

তা হলে আর দেরি নয়। চল্ গড়বেতা।

মাঝ রাতে আপ হাওড়া চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে গড়বেতা স্টেশনে নামলো গামাপ্রসাদ তেওয়ারী। স্টেশনে হাজির ছিলো সেই লম্বা ঢ্যাঙা লোকটা। ওয়েটিং রুমে বেঞ্চে বসে লম্বা লোকটা সব কিছু নজর রাখছিলো। বেঞ্চ থেকে উঠে প্লাটফর্মে এগিয়ে গিয়ে গামাপ্রসাদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো।

দুজন হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফর্ম থেকে নিচে রাস্তায় নেমে এলো। রেলের পোর্টার, দু'একটা ভবঘুরে ছাড়া আর কেউ নেই। অবশ্য একটা চায়ের দোকান খোলা ছিলো। দেখে গামাপ্রসাদ বললো,—শ্যামচাঁদ, দাঁড়াও। চা খাবো। হুড়োহুড়ি করে এত কাজ করতে হয়েছে, বিকেলের পর এক কাপ চা-ও খাওয়া হয়নি।

গাড়িতে লোলো আছে।

তিনটে চা বলো তা হলে।

স্টেশন চত্বরে বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছিলো। একটু দূরে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো একটা ছাই রঙের অ্যাম্বাসাডর। শ্যামচাঁদ দ্রুত হেঁটে গিয়ে অ্যাম্বাসাডরের সামনে দাঁড়িয়ে বললো,—লোলো, চা খাবি চল্।

ওরা যখন স্টলে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলো, তখন গড়বেতা থানার একটা জিপ রুটিন

পেট্রলে বেরিয়ে স্টেশন চত্বরে ঢুকেছিলো। এত রাতে গামাপ্রসাদের মতো এলাকার নামজাদা এক ব্যবসায়ীকে দেখে জিপে বসে থাকা সার্জেন্টের খানিকটা কৌতূহল হলো। সে ড্রাইভারকে বললো,—গাড়ি ঐ টি-স্টলের কাছে নিয়ে চলো।

জিপ টি স্টলের কাছে এসে দাঁড়াতে সার্জেন্ট গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কি তেওয়ারী সাহেব, এত রাতে এখানে?

একটু কাজে গিয়েছিলাম। আপাতত চায়ের তেষ্টা মেটাচ্ছি। বাড়িতেই ফিরবো।

এবার সার্জেন্টের চোখ পড়লো গামাপ্রসাদের দুই সঙ্গীর দিকে। লম্বা ঢ্যাঙা একজনের হাতদুটো এতটাই লম্বা যে হাঁটুর নিচে নেমে গেছে। তাকে যে-কোন মানুষের নজরে পড়ারই কথা। পুলিস জিপে বসে থাকা সার্জেন্ট ও দুই কনস্টেবল এবং ড্রাইভার—চারজনই শ্যামচাঁদকে দেখছিলো। ওদের আরো যেটা অবাক করলো, গড়বেতা শহরে গামাপ্রসাদের মতো বিশিষ্ট লোকের এত ঘনিষ্ঠ এই দুজনকে এরা আগে কখনো দেখেনি। পুলিসের চোখ। যা দেখে, চট করে ভোলে না।

পুলিসের জিপ চলে গেলো। মিনিট তিনেকের মধ্যে চা খেয়ে গামাপ্রসাদ ও তার সঙ্গীরা ছাই রঙের অ্যাম্বাসাডর নিয়ে রওনা দিলো। গাড়িতে শ্যামচাঁদ জিজ্ঞেস করলো,—গামাবাবু, কততে হিসেব হলো?

পাঁচে।

শুনে শ্যামচাঁদের মুখ কালো হয়ে গেল।

গড়বেতার একটা এস টি ডি বুথ থেকে বেলা এগারোটা নাগাদ কেদার মজুমদার বিষ্ণুপুর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে প্রবীর দত্তকে টেলিফোন করলেন।

কেদারের গলা পেয়ে প্রবীরবাবু তো টেলিফোনেই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন,—আরে কেদারবাবু! আপনার ফোনের জন্য হাঁ করে বসে আছি।

কেন? কি হলো?

বিষ্ণুপুর থানা থেকে আপনাকে খুঁজছিলো। আপনি বিষ্ণুপুর থানার টেলিফোন নাম্বারটা নিন। দীনেনবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। বললেন,—খুব জরুরি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেদার মজুমদার টেলিফোনে বিষ্ণুপুর থানায় ফোন করে দীনেন্দ্র সান্যালকে ধরলেন,—হ্যালো দীনেনবাবু। আমি কেদার মজুমদার বলছি। তলব করছিলেন কেন?

অনেক খবর আছে। আমরা একটু নড়েচড়ে বসেছি। যাই হোক, আপনি গড়বেতা থানায় যোগাযোগ করুন। ইনফরমেশন আছে। আমি গড়বেতা থানাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যাচ্ছেন।

থ্যাঙ্ক য়ু! আপনাদের সাহায্য পেলে আমাদের কাজও স্মুথলি এগোবে।

এস টি ডি বুথ থেকে বেরিয়ে কেদার বললেন,—বদ্রী, মনে হচ্ছে ঢ্যাঙা লোকটার খোঁজ পাওয়া গেছে।

গড়বেতা শহর থেকে দুপুর বারোটা নাগাদ একটা কালো রঙের জিপ চন্দ্রকোণা শহরের দিকে রওনা দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে চন্দ্রকোণা রোড রেল স্টেশনের কাছে চলে এলো। স্টেশনের কাছেই একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি। সামনেই দাঁড়ালো জিপ। পাটোয়ারীকে দেখা গেল জিপ থেকে নামতে। পাটোয়ারী ঢুকে পড়লো সেই বাড়ির ভেতর। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে, দরজাগুলো লক্ করে চাবি দিয়ে ড্রাইভার লোলোও একটু পরেই বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

দোতলার পেছন দিকে একটা ঘরে চেয়ারে বসেছিলো গামাপ্রসাদ।

ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা খাট, একটা টুল ছাড়াও আরো একটা চেয়ার। খাটে বসে আছে শ্যামচাঁদ, টুলে লোলো আর চেয়ারে পাটোয়ারী।

গামাপ্রসাদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সবাইকার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করছিলো। শেষ পর্যন্ত নিজেই মুখ খুললো,—মাঝখানে মাত্র একদিন সময় আছে। পরশুদিনই লোকটাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু গামাবাবু, আমরা কত করে পাবো, ঠিক হলো না!

পঞ্চাশ করে তোমরা পাবে। আমি কাউকে ঠকাবো না।

এ-কথায় আর সবাই খুশি হলেও শ্যামচাঁদ কিন্তু মুখ কালো করে রইলো। গামাপ্রসাদ সেটা খেয়াল করেছে। তবুও গামাপ্রসাদ আসল কথায় ফিরে এলো। বললো,—কাল রাতেই মালটাকে নিয়ে আমরা রওনা দেবো। হ্যাঁ। আমাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স হলে পুলিসের সন্দেহের বাইরে থাকা যায়।

সে একটা ঠিক করে ফেলছি আমি।—বললো পাটোয়ারী।

না, না। ছিনতাই করে নয়। বারো-চৌদ্দ ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিতে হবে। তাঁতীটাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওদের হাতে তুলে দিয়েই ফিরে আসবে। কাল রাতে আমরা রওনা দিচ্ছি। ভোরে মাল খালাস হওয়া মাত্রই পেমেন্ট। তোমরা সবাই কলকাতা চলে যাবে।

আলাদাভাবে?

পাটোয়ারী আলাদা যাবে। ওর এখানকার পুলিসের খাতায় নাম আছে। মাঝ রাতে পুলিস যদি রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স আটকায়, পাটোয়ারীকে দেখলে সন্দেহ করতে



কেদার দ্রুত এগিয়ে দরজার তালা খুলে ফেললেন

পারে।

তা হলে আমিই যাবো।—বললো শ্যামচাঁদ।

শ্যামচাঁদের আচরণে গামাপ্রসাদ মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বললো না। বললো,—ঠিক আছে, তুমিই যাবে। তোমাকে আর লোলোকে এখানে কেউ চেনে না। কেউ জানতে চাইলে বলবে, আমাদের আত্মীয়। হার্টের পেশেন্ট। পেশেন্টের সামনে বেশি কথা অথবা চিৎকার চেঁচামেচি চলবে না।

আর পাটোয়ারী?

ও আলাদাভাবে ট্রেনে যাবে।

চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনের লাগোয়া এই নতুন ঝকঝকে দোতলা বাড়ির উল্টোদিকে খানিকটা ডাইনে এগিয়ে গেলে একটা চায়ের দোকান, একটা তেলেভাজা-ঘুগনি-আলুরদমের দোকান। দোকানে একটা দাড়িওয়ালা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা লোক ঘুগনি খাচ্ছিলো। বাড়ি থেকে পাটোয়ারী আর লোলো বেরুনো মাত্রই লোকটা উঠে চায়ের দোকানে গিয়ে বললো,—একটা চা দিন তো দাদা।

চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে চার-পাঁচজন বসে আছে। বেঞ্চির শেষপ্রান্তে বসে থাকা লোকটার পেছনে গিয়ে সে একটু ঠেলা দিলো। লোকটা ঘুরে তাকাতেই সে ওই বাড়ি থেকে বেরুনো লোলো আর পাটোয়ারীকে ইশারায় দেখিয়ে দিলো।

বেঞ্চি থেকে লোকটা উঠে চায়ের দাম মিটিয়ে দিলো। ঘুগনি খেতে খেতে দাড়িওয়ালা বসে পড়লো বেঞ্চিতে।

সেই রাতে যে পুলিস সার্জেন্ট টহলে বেরিয়ে গড়বেতা স্টেশন চত্বরে সঙ্গী সহ গামাপ্রসাদ তেওয়ারীকে দেখেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই গড়বেতা থানায় কথা বলছিলো কেদার আর বদ্রী।

অনুপবাবু, এই গামাপ্রসাদ তেওয়ারী লোকটা কেমন?

এমনিতে কোনো খারাপ অভিযোগ নেই। ধানচালের কারবারী। ইদানীং প্রচুর পয়সা করেছে। চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনের কাছে চার বিঘে জমির ওপর একটা বাড়ি করেছে রিসেন্ট।

ওঁর পুরনো বাড়ি কোথায়?

গড়বেতা শহরেই। হঠাৎ এত পয়সা লোকটার হাতে এলো কি করে, সেটা ভাববার বিষয়।

টেলিফোন বাজলো। সার্জেন্ট অনুপ মিশ্র উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। ও সি-র গলা,—অনুপ, টেলিফোন ধরো। আমাদের ইনফর্মার কথা বলবে।

মিনিট পনেরো বাদে অনুপ মিশ্র ফিরে এসে বললেন,—আপনাদের জন্য আরো

সুখবর আছে।

কি?

গামাপ্রসাদের চন্দ্রকোণার বাড়িতে পাটোয়ারী আর সেই লম্বা লোকটাকে দেখা গেছে।

তা হলে আমার অনুমান মোটামুটি ঠিক পথেই এগোচ্ছে। শুধু খোঁজ নেই অজিত তন্তুবায়ের। অজিত তন্তুবায় প্রবীরবাবুর কাছে লম্বা লোকটার নাম করেছিলেন। পাটোয়ারীর নাম পেয়েছি অজিতবাবুর তাঁতঘরে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো গামাপ্রসাদ তেওয়ারী। তিনজন একই সরলরেখায় এসেছে। মূল সূত্র কিন্তু অজিত তন্তুবায়, এটা আমাদের ভুললে চলবে না।—বললো বদ্রীনারায়ণ।

অনুপ মিশ্র মনে মনে বদ্রীর চিন্তাভাবনার তারিফ করছিলেন। বললেন,—আমরা পাটোয়ারী আর লম্বা লোকটার পেছনে ইনফর্মার লাগিয়ে রেখেছি। ওদের ডেরারও খোঁজ পেয়েছি।

আমরা একটু ঐ ডেরায় ঢুকতে চাইছি। সম্ভবত ওরা অজিতবাবুকে দূরে কোথাও সরাতে পারেনি।

কেদারের কথা শুনে অনুপ মিশ্র বললেন,—আমাদের ও সি-র সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিন।

ঘর অন্ধকার। জানালাগুলো বাইরে থেকে বন্ধ। দূরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আরো দূর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে—সেটাও অজিত তন্তুবায় বুঝতে পারছিলেন। এটা যে একেবারে গ্রাম নয়, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু জায়গাটা কোথায়? কেনই বা এরা আটকে রেখেছে আমাকে? —এই সব নানা চিন্তায় ডুবে থাকেন অজিতবাবু। ওরা অবশ্য কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। লোকগুলো যাকে গামাবাবু বলে ডাকে, সে রাতে একবার, সকালে একবার খোঁজ নিয়ে যায়।

দরজা খোলার শব্দ। অন্ধকারে থাকতে থাকতে অজিতবাবুর চোখ সয়ে গেছে। বিকেলের খাবার নিয়ে একজন ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে পাটোয়ারী। হাসিমুখে কথা শুরু করলো সে,—অজিতবাবু তো এবার মনের সুখে শাড়ি বুনতে পারবেন।

আমি ছাড়া পাবো কবে?

কাল-পরশুর মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাবেন।

এদের কথা বিশ্বাস হয় না অজিতবাবুর।

পাটোয়ারীকে নজরে রেখেছিলো গড়বেতা থানার ইনফর্মার। চন্দ্রকোণা রোডে গামাপ্রসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাটোয়ারী রেললাইন ধরে আরো খানিকটা

এগিয়ে একটা পুরনো বাড়িতে গিয়ে ঢোকে। দু'বেলাই যায়। ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টাদুয়েক থেকে ফের বেরিয়ে পড়ে।

আজ বিকেলে পাটোয়ারী যখন বাড়িটা থেকে বেরিয়ে চলে গেল, তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। কেদার আর বদ্রীকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই গড়বেতা থানার সেই ইনফর্মার পাটোয়ারীর পিছু নিয়ে চলে গেলো।

কেদার আর বদ্রী সবকিছু নজরে রেখে সেই রাস্তা ধরে আনমনে পায়চারি করছিলো। বদ্রী বললো,—কেদারদা, রেললাইনের ওপরে উঠে পড়ো, দেখার সুবিধে হবে, উনি তো বললেন, বাড়ির কেয়ারটেকার সন্ধেবেলায় বাজারে যায়।

টর্চ আছে তো?

আছে।

ওরা দুজন রাস্তা ছেড়ে রেললাইনে উঠে পড়লো। সত্যিই, এখান থেকে ওই বাড়িটা আরো ভালো দেখা যায়। একটু পরে বদ্রী হঠাৎ বললো,—কেদারদা, দ্যাখো দ্যাখো। একটা লোক বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছে।

কেদারও দেখলেন, থলি হাতে লোকটা বাড়ির বাইরে এসে বাইরে থেকে গেটে তালা দিয়ে, চারদিক ভালো করে দেখে, চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনের দিকে চললো। বদ্রী বললো,—কুইক কেদারদা! লোকটার বাজার করে ফেরার আগেই তোমাকে কাজ সারতে হবে।

কেদার রেললাইন থেকে ঝট্ করে নেমে পড়লেন। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন কয়েক সেকেন্ড। পকেট থেকে মাস্টার কি বের করে, তালা খুলে, তালাটা ফের আংটার সঙ্গে আটকে ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। বাইরে থেকে বদ্রীনারায়ণ তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলো সবদিকে।

পুরো বাড়িটা নিস্তব্ধ। একটাও আলো জ্বলছে না। খানিকক্ষণ পা টিপে টিপে চলাফেরা করে কেদার যখন বুঝলেন, এই মুহূর্তে কেউ বাড়িতে নেই, তখনই তিনি স্বাভাবিকভাবে এ-ঘর সে-ঘর দেখতে লাগলেন। দুটো করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় গেলেন। কিন্তু দোতলার ছ'খানা ঘরে কেউ নেই, কিছু নেই। কেদার লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লেন একতলায়। বাড়ির শেষ প্রান্তে বাথরুমের লাগোয়া ঘরটাও বাইরে থেকে তালাবন্ধ। কিন্তু দরজার ফোঁকর দিয়ে সরু সুতোর মতো আলো বেরিয়ে আসছে। বাইরের দিকে একটা টেম্পোরারি ইলেকট্রিক সুইচ লাগানো। সেখান থেকে ইলেকট্রিক তার পাকাপাকি ওয়্যারিং করে ভেতরে নেওয়া হয়নি। আলগাভাবে নেওয়া হয়েছে। কেদারের হাতের পেনসিল টর্চ সেই তারের চলার পথ ধরে এগলো। তারটা এই ঘরের ভেতরেই ঢুকেছে। কেদার কি ভেবে বাইরের সুইচ অফ করে দিলেন। ভেতরের আলো নিভে গেল।

টেম্পোরারি ওয়্যারিং কেন? ঘরের আলোর সুইচ বাইরেই বা কেন?

একটু ভেবে কেদার ঘরের দরজায় নক করলেন। সুইচটা ফের অন করে দিয়ে ডাকলেন,—ভেতরে কি কেউ আছেন? থাকলে সাড়া দিন।

কেদার এরপর অনুমানের ওপর ভর করেই ডাকলেন,—অজিতবাবু ভেতরে নাকি? আমরা পুলিসের লোক। সাড়া দিন।

ঘরের ভেতর থেকে কারুর অস্পষ্ট কথা শোনা গেল। কেদার দ্বিরুক্তি না করে মাস্টার কি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন,—আপনি কি অজিত তন্তুবায়?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো মানুষটা। কেদার বললেন,—চিন্তা নেই ; আমরা পুলিসের লোক। আমরা আপনার ভাই অজয় আপনার ছেলে মানস আর আপনার স্ত্রী মিনতিদেবীর কথামতোই আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। ভয় পাবেন না। চুপচাপ থাকবেন। কোনো কথা বলবেন না। আমরা এই বাড়ি ঘিরে রেখেছি। লোকগুলোর নাম জানেন, যারা আপনাকে তুলে এনেছে?

পাটোয়ারী, গামাপ্রসাদ, লোলো, খায়রুল, শ্যামচাঁদ। আরো দুজন আছে। নাম মনে নেই।

বাইরে থেকে একটা হুইসিলের শব্দ ভেসে এলো। কেদার কান খাড়া করলেন। আবার সেই শব্দ। বুঝলেন, বদ্রী ওয়ার্নিং দিচ্ছে। কেদার বললেন,—অজিতবাবু, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা আছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে কেদার মাস্টার কি দিয়ে ফের তালা লাগিয়ে দ্রুত হেঁটে একেবারে বাড়ির বাইরে। গেটে তালা দিয়ে আরো দ্রুত রেল লাইনের দিকে হাঁটা দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে কেয়ারটেকার ঢুকলো বাড়িতে।

আরো মিনিট দশেক অপেক্ষা করে, অস্বাভাবিক কোনো কিছু না দেখে ওরা দু'জন গড়বেতা থানার দিকে রওনা দিলো।

পাঁচ

কেদার-বদ্রী গড়বেতা থানায় গিয়ে ও সি সুকোমল বাগচীর সঙ্গে দেখা করে রেললাইনের ধারে সেই পুরনো বাড়িটা নজরে রাখতে একজন পুলিস দেবার অনুরোধ করলেন। সুকোমলবাবু সব শুনে বললেন,—আমরা ফোর্স পাঠিয়ে এক্ষুনি অজিত তন্তুবায়কে তুলে নিয়ে আসি।

বদ্রীনারায়ণ এ-ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানালো।—না! এক্ষুণি নয়। আরো একটু

জাল গুটিয়ে আনি। আপনি যদি পারেন, বিষ্ণুপুর থানাকে বলে অজিতবাবুর স্ত্রী, ছেলে এবং ভাইকে গড়বেতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দিন।

সে হয়ে যাবে।

সার্জেন্ট অনুপ মিশ্র ও সি-র ঘরে ঢুকলেন। কেদার-বদ্রীকে দেখে বললেন,—শুনলাম আপনারা আছেন, তাই খবরটা দিতে এলাম। পাটোয়ারী আজ একটু আগে এখানকার একটা নার্সিং হোমে গিয়ে আগামীকাল রাতের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স বুক করেছে।

সেটা যাবে কোথায়?

তা আমাদের ইনফর্মার জানেনি।

বদ্রী তড়িঘড়ি উঠে পড়লো। ও সি সুকোমলবাবুকে বললো,—স্যার, অজিত তন্তুবায় যে বাড়িতে আটক আছে, আপনি শুধু সেই বাড়িতে পাহারার ব্যবস্থা করুন। একটুও যেন ফাঁক না পড়ে। এদিকের ব্যাপারগুলো আমরা দেখছি। অনুপবাবু, নার্সিং হোমের নাম আর ঠিকানা দিন। আমি আর কেদারদা ওখান থেকে ঘুরে আসি।

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে গামাপ্রসাদ তেওয়ারী। গড়বেতা শহরের বুকে গামাপ্রসাদের বিরাট বাড়িখানার পেছন দিকে একটা মন্দির। ভোরবেলা স্নান সেরে গামাপ্রসাদ গেরুয়া ধুতি পরে খালি গায়ে সেই মন্দিরে পুজোয় বসেছে।

খানিকক্ষণ বাদেই পৌনে আটটা নাগাদ এলো শ্যামচাঁদ। তারপর খায়রুল। একসঙ্গে ঢুকলো পাটোয়ারী আর লোলো।

ওরা ভেতরের দিকে একটা ঘরে চলে গেল। পুজো থেকে উঠে মিনিট কুড়ির মধ্যে নিজেকে তৈরি করে গামাপ্রসাদ ওদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলো।

দুপুরবেলা গড়বেতা থানা থেকে নার্সিং হোমে একটা ফোন গেল। ফোন পেয়ে নার্সিং হোমের মালিক তড়িঘড়ি ছুটলো থানায়।

থানায় ও সি-র ঘরে বসেছিলেন কেদার মজুমদার এবং অনুপ মিশ্র। বদ্রীনারায়ণ এলো একটু পরে। নার্সিং হোমের মালিকের নাম প্রাণবন্ধু মাইতি। ও সি সুকোমল বাগচী প্রাণবন্ধুবাবুকে বললেন,—ইনি হচ্ছেন কেদার মজুমদার। গতকাল সন্ধেয় কেদারবাবু তো আপনার নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ স্যার।

সে ব্যাপারে আপনি বা আপনার লোকজন কাউকে কিছু বলেনি তো?

না। আমি ব্যাপারটা আর কাউকে জানাইওনি।

থ্যাঙ্ক ইউ। এখন কেদারবাবু আর এই বদ্রীনারায়ণ আপনার সাথে একটু কথা

বলবে। এরা যা যা বলবেন, আপনি সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে একটা বড় ধরনের ক্রাইম মোকাবিলা করতে আশাকরি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই করবো। শুধু—

বুঝতে পেরেছি। আপনার নার্সিং হোমের যাতে বদনাম না হয়, সেটা অবশ্যই দেখা হবে।

ওরা যখন আলাদা ঘরে কথা বলতে গেল তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিষ্ণুপুর থেকে এসে পৌঁছলো অজিত তন্তুবায়ের স্ত্রী, ছেলে এবং ভাই।

লোলো গাড়ি চালাচ্ছিলো। গড়বেতার বাড়ি থেকে গামাপ্রসাদ পাটোয়ারীকে নিয়ে সেই কালো ঢাকা জিপে যাচ্ছিলো চন্দ্রকোণা রোডের দিকে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে গামাপ্রসাদের বাড়ির দুশো হাত দূরত্বে একটা টেলিফোন বুথ থেকে একজন ফোন করলো,—স্যার, গামাপ্রসাদ এইমাত্র পাটোয়ারীকে নিয়ে একটা কালো জিপে চন্দ্রকোণার দিকে যাচ্ছে। জিপের নম্বর ডব্লু বি আঠারো



দু'টো লম্বা হাত আমাকে ধরতে চাইছে

চৌষট্টি। গাড়ি চালাচ্ছে লোলো। এই নামটা আজকে জানা গেছে।

গড়বেতা থানায় তখন কেদার-বদ্রী মিনতিদেবী, মানস এবং অজয় তন্তুবায়ের সঙ্গে কথা বলছিলো। একজন কনস্টেবল এসে বললো,—কেদারবাবু, ও সি সাহেব আপনাকে ডাকছে।

কেদার তাড়াতাড়ি করে সুকোমলবাবুর ঘরে গেলেন। সুকোমলবাবু টেলিফোনে কথা বলছিলেন। ইঙ্গিতে কেদারকে বসতে বললেন।

সুকোমলবাবু প্রৌঢ় মানুষ। ধীর-স্থির। কোন কাজে তাড়াহুড়ো নেই।

মিনিটখানেক পরে টেলিফোন রেখে সুকোমলবাবু কেদারকে বললেন,—আপনি মোটামুটি রেডি হয়ে থাকবেন। ওরা আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে বেরোবে।

প্র্যাকটিক্যালি আমি রেডি হয়েই আছি।

হ্যাঁ, আরেকটা খবর আছে। গামাপ্রসাদ আর পাটোয়ারীরা একটু আগে গড়বেতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রকোণার দিকে রওনা হয়েছে।

তাই নাকি!

অবশ্য আমাদের লোকেরা ওদের পুরো নজরের মধ্যেই রেখেছে।

ঠিক আছে। তবুও বদ্রীর ওই বাড়িটা নিয়ে চিন্তা বেশি। ও কিছু একটা আশঙ্কা করছে হয়তো।

বদ্রীকে ডাকছি আমি।

বদ্রী এলে তাকে ব্যাপারটা বলায় সে বললো,—আমি এক্ষুনি চন্দ্রকোণাতে চলে যাই। কেদাবদা, তুমি এদিকটা গুছিয়ে নাও। কেননা, অজিতবাবুকে হাতে পেয়েও আমরা ওকে উদ্ধার করিনি। কিছু একটা ঘটে গেলে আফশোস করে মরতে হবে।

অন্ধকার ঘরে বন্দী অজিত তন্তুবায় বুঝতে পারছিলেন, বাড়ির মধ্যে অনেকে ঢুকেছে। এমনকি গামাপ্রসাদের ভারী গলার আওয়াজও পাচ্ছিলেন। কালকে পুলিসের লোকটা দেখা করে যাবার পর থেকে যেন বুকে ভরসা পেয়েছেন অজিতবাবু। তবুও আকাশপাতাল চিন্তা হচ্ছিলো। আর তো কেউ এলো না! সত্যিই কি লোকটা পুলিসের?

হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। পাটোয়ারী ঢুকলো। বললো,—কি অজিতবাবু! শরীর কেমন?

অজিতবাবু মুখে কিছু না বলে ঘাড় নাড়লেন। পেছনেই ঢুকলো গামাপ্রসাদ। কপালে লাল চন্দনের টিপ। পরিধানে পট্টবস্ত্র। সে অজিতবাবুর কাছে এগিয়ে গেল। বললো,—কি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? আজকেই এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন।

গামাপ্রসাদ অজিতবাবুর পাশে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলো,—অজিতবাবু, আপনি তো বালুচরী শাড়ির মস্তো বড় শিল্পী। ঠিকঠাক জায়গায় গেলে প্রচুর টাকা কামাতে পারবেন। ইচ্ছে করে না?

অজিতবাবুর মনেই হচ্ছিলো, ওরা কোনো মতলব এঁটে এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। এসব কথার উত্তর দেবার ইচ্ছেই হলো না তাঁর।

গামাপ্রসাদের ডান হাত ছিলো তার পাঞ্জাবির ডান পকেটে। হঠাৎই সে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে অজিত তন্তুবায়ের নাকে চেপে ধরলো। পাটোয়ারীও পাশে এসে অজিতবাবুর হাতদুটো ধরে নিলো।

একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ...কি আরাম! সমস্ত শরীর জুড়ে নেমে এলো অবসাদ...ঘুম...রাজ্যের ঘুম এসে অজিতবাবুকে কোন্ স্বপ্নের জগতে নিয়ে চলে গেল। দু'একবার চাইবার চেষ্টা করলেন তিনি। পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। গামাপ্রাসাদ আর পাটোয়ারী ধরে নিলো অজিত তন্তুবায়কে। তারপর শুইয়ে দিলো মেঝেতে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেলেও এখনো অন্ধকার নামেনি। বদ্রী বাড়িটার সামনের রাস্তায় ঘুরলো খানিকক্ষণ। বাড়ির ভেতরে লোকজন আছে, এটা বুঝতে



প্রায় অজ্ঞান রোগীকে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো।

পারলো। থানা থেকে পাঠানো দুই ইনফর্মার সব কিছু তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখছিলো।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ নার্সিং হোমের মালিক প্রাণবন্ধু মাইতি গড়বেতা থানায় টেলিফোন করলেন। ও সি ফোনে কথা শেষ করে অনুপ মিশ্রকে ডেকে বললেন,—কেদারবাবুকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দাও।

নার্সিং হোম থেকে অ্যাম্বুলেন্স বের হলো পৌনে আটটায়। পাটোয়ারীই এসেছিলো। অ্যাম্বুলেন্সের চালকের সঙ্গে আরো একজনকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো,—ইনি কি যাবেন?

হ্যাঁ। এতদূর যেতে হবে রোগী নিয়ে। একজন এক্সট্রা লোক না থাকলে হবে কী করে?

এই ব্যাপারটায় পাটোয়ারী একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেও মুখে কিছু বললো না। অ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়লো। বললো,—চলুন। চন্দ্রকোণা থেকে রোগী তুলে নেবো।

একই সময়ে গড়বেতা থানার কাছ থেকে লোকজন ভর্তি দুটো প্রাইভেট কার ছাড়লো। বেশ দ্রুত চললো গাড়ি দুটো। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়লো জাতীয় সড়কে। কলকাতামুখী চলতে লাগলো। কিন্তু খুব ধীরে ধীরে।

চন্দ্রকোণায় রেললাইনের পাশেই সেই পুরনো বাড়ি থেকে স্ট্রেচারে করে প্রায় অজ্ঞান রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো। এই বাড়ি থেকে রোগীর সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে চললো গামাপ্রসাদ আর সেই লম্বা ঢ্যাঙা শ্যামচাঁদ। পাটোয়ারী গেল না।

গামাপ্রসাদ বললো,—তোমরা ট্রেনে চলে যেও।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো,—রোগীর কাছে কে থাকবে? কোন ওষুধপত্র দেবার দরকার হবে? এতটা রাস্তা যাবার মতো ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বেরিয়েছেন তো? হার্টের রোগী বলেই আগে থেকে সবটা জেনে নিচ্ছি।

শ্যামচাঁদ হুট করে বলে দিলো,—ও ঠিক আছে। আমরা দুজন ড্রাইভারের কেবিনেই বসবো। আপনাদের হেল্পার ভেতরে পেশেন্টের সঙ্গে থাকুক।

তা হলে কখন কি ওষুধ লাগবে আমাদের বুঝিয়ে দিন। পাঁচ ছ' ঘণ্টার জার্নি। রাস্তায় কোনো কারণে আরো দেরি হতে পারে।

এরকম ব্যাপার-স্যাপার আগে আঁচ করতে পারেনি গামাপ্রসাদ। অস্বস্তি সামলাতে শেষ পর্যন্ত বললো,—ঠিক আছে। শ্যামচাঁদ, তুমি পেশেন্টের সঙ্গে থাকো।

শ্যামচাঁদের এমন ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু গামাপ্রসাদ তেওয়ারী এতটা জোরের সঙ্গে বললো যে, সে সেই মুহূর্তে আর না করতে পারলো না।

অ্যাম্বুলেন্স ছাড়লো। চন্দ্রকোণা শহর ছাড়িয়ে জাতীয় সড়কে উঠে পড়লো। রাস্তা অন্ধকার।

গড়বেতা শহর ছাড়িয়ে মাইলখানেকের মধ্যেই জাতীয় সড়ক থেকে নেমে পাশের ইঁট বাঁধানো রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো সেই অ্যাম্বাসাডর দুটো। অ্যাম্বাসাডরের সমস্ত আরোহী রাস্তায় নেমে পড়েছে। গাড়ি দুটোয় কোন আলো জ্বলছে না।

ওদিকে অ্যাম্বুলেন্সও জাতীয় সড়ক ধরে মাঝামাঝি গতিতে ভালোভাবেই চলেছে। যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। চলছে গাড়ি।

একটু দূরে রাস্তার মাঝখানে কি একটা দেখে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার নেপাল আগে থেকেই হর্ন বাজালো।

নেপালদা, কি হলো?

রাস্তার মাঝখানে মনে হচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে?

একজন নয়। দু'তিন জন। একজন মহিলাও আছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ। ওরা তিনজনই দেখলো, একটি পুরুষ, একটি মহিলা ও একটি কিশোর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গাড়ি থামাতে বলছে।

দেখে গামাপ্রসাদ বললো,—জোরে হর্ন দিন। পাশ কাটিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করুন।

কিন্তু হর্ন শুনেও ওরা নড়লো না। অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে পড়লো। গামাপ্রসাদ মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো,—কী হয়েছে! রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইয়ারকি হচ্ছে?

মহিলাটি কেঁদে উঠলো। আমার শাশুড়ির ভেদবমি হচ্ছে গো! এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গেলে মরে যাবে! তোমাদের গাড়িতে একটু নিয়ে চলো না বাবা!

চেঁচামেচি শুনে রোগীর কেবিন থেকে শ্যামচাঁদ রাস্তায় নেমে জিজ্ঞেস করলো,—কী হয়েছে?

গামাপ্রসাদ ক্ষিপ্ত হয়ে বললো,—যত্তো সব উটকো ঝামেলা! সরো রাস্তার মাঝখান থেকে।

ততক্ষণে ড্রাইভার আর হেল্পার গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। সেই কিশোর ছেলেটি অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে চলে গিয়েছিলো। শ্যামচাঁদ পেছনের দরজা বন্ধ করেনি। ছেলেটা অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে শুয়ে থাকা অজিত তন্তুবায়কে দেখে চিৎকার করে উঠলো,—মা! কাকু! এই তো এখানে বাবা! এরা বাবাকে নিয়ে

পালাচ্ছে।

ঐ কথা শুনে গামাপ্রসাদ আর শ্যামচাঁদ জোর ধমক দিয়ে উঠলো। ড্রাইভারকে বললো,—আপনি স্টিয়ারিংয়ে বসুন।

কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকার ফুঁড়ে সাত আটজন বন্দুকধারী পুলিস অনুপবাবুর নির্দেশে অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে ফেলেছে। শ্যামচাঁদ পালাবার চেষ্টা করছিলো। ড্রাইভারের হেল্পাররূপী কেদার ফ্লাইং সসারের মতো উড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর।

বদ্রী নির্দেশ দিলো,—মানস আর মাসিমা অ্যাম্বুলেন্সে অজিতবাবুর কাছে গিয়ে বসুন।

গামাপ্রসাদ হতভম্ব। তবুও সে মরিয়া হয়ে চিৎকার করলো,—এ সব কী হচ্ছে!

কেদার হাসতে হাসতে বললেন,—গামাবাবু, আপনার অভিনয়ে চিড়ে ভিজবে না। লোলো আর পাটোয়ারীকে স্টেশন প্লাটফর্ম থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। অজিতবাবুকে আগেই উদ্ধার করতে পারতাম আমরা। মালসমেত আপনাকে ধরবো বলেই সময় নিয়েছি।

চমকে গেলো গামাপ্রসাদ। ততক্ষণে শ্যামচাঁদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বাসাডর দুটোকে মুখ ঘুরিয়ে সড়কের ওপর তোলা হলো। অনুপ মিশ্র বললো, গামাবাবু, আমাদের গাড়িতে এসে বসুন। যা বলবার কোর্টকে বলবেন। আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো।

সবগুলো গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে ফের ছুটলো গড়বেতার দিকে।

পরদিন সকালে অজিত তন্তুবায়, মিনতিদেবী, অজয় ও মানস বিষ্ণুপুর চলে গেল। সঙ্গে কেদার মজুমদার এবং বদ্রীনারায়ণ।

সেদিন বিকেলবেলা বিষ্ণুপুর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দপ্তরে প্রবীর দত্তের ঘরে বসে গল্প করছিলো কেদার ও বদ্রী। কেদার বললেন,—পুরো অপারেশনের কৃতিত্বই অজিত তন্তুবায়ের। লম্বা লোকটার কথা উনিই আপনাকে বলে গিয়েছিলেন।

বদ্রী বললো, দ্বিতীয়ত, তাঁতঘরের মাটির মেঝেতে অজিতবাবুই পাটোয়ারীর নামটা লিখে গিয়েছিলেন। যা আমাদের দারুণ কাজে লেগেছে।

একটা ব্যাপার দেখুন। অজিতবাবু শান্তশিষ্ট, অন্তর্মুখী শিল্পী মানুষ। খুব কম কথা বলেন। সবাই মনে করে গোবেচারা। কিন্তু আমি গোড়াতেই বুঝেছি, ইনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বড় শিল্পীরা সাধারণত ছোটখাটো বিষয়ে নিজেদের জড়ায় না। কিন্তু বিপদের সময় বোঝা যায়, এরা প্রচণ্ড বুদ্ধি রাখে।

পরের দিনই কেদার-বদ্রী কলকাতায় ফিরে গেল।

সোনায় মোড়া রুপোর ফুলদানি



গোয়েন্দা কেদার মজুমদার এবং তাঁর সহকারী বদ্রীনারায়ণ মুখার্জির দপ্তর হচ্ছে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে। নাম 'উদিতভানু ইনফরমেশন'। রবিবার ভোর পৌনে ছ'টা নাগাদ তাঁদের দপ্তরে টেলিফোন বেজে উঠলো। কেদার তখন বাইরে চত্বরে ক্যারাটে প্র্যাকটিস করছিলেন। বদ্রীনারায়ণ একটা পপুলার সায়েন্সের বই নিয়ে বসেছিল। বই রেখে টেলিফোন ধরলো বদ্রী।

হ্যালো।

হ্যালো। এটা কি উদিতভানু ইনফরমেশন?

হ্যাঁ, বলুন! কাকে চাইছেন?

মিস্টার কেদার মজুমদার আছেন না কি?

আছেন। আপনি কে বলছেন?

আমার নাম প্রহ্লাদ চক্রবর্তী। একটা সমস্যায় পড়েছি। কেদারবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ধরুন একটু।

বদ্রীর ডাক পেয়ে কেদার এসে টেলিফোন ধরলেন।

হ্যাঁ, বলুন!

আমি প্রহ্লাদ চক্রবর্তী। বিডন স্ট্রিটে থাকি। আমার একটা মূল্যবান জিনিস খোয়া গেছে। আপনাকে একটু দরকার।

চলে আসুন দশটা নাগাদ। আমি উদিতভানু ইনফরমেশনে আছি। আপনার বিডন স্ট্রিট থেকে কাছেই তো! বাগবাজারের ট্রামে উঠে পড়লেই হলো।

ধন্যবাদ।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কেদার বদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বই ঘাঁটছিস?

এই তো বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি থেকে 'ব্ল্যাক হোল'-এর ওপর একটা বই এনেছি।

বাঃ। 'ব্ল্যাক হোল' তো দারুণ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। তা আমাদের মাসি আজ কি রাঁধছে?

লাউ দিয়ে মুগ ডাল, সর্ষে বাটা দিয়ে বেলে মাছ, আর বেগুন ভাজা।

ঠিক আছে। আমি আর একটু প্র্যাকটিস করে নিই—বলে কেদার বাইরে বেরোলেন। বদ্রী ফের বই নিয়ে বসলো।

ঠিক দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে প্রহ্লাদ চক্রবর্তী কেদার-বদ্রীর কাছে হাজির হলেন। গেটম্যান দিলানন্দ সিংকে ডাকলেন কেদার। দিলানন্দ ঝটিতি হাজির।

কিদারবাবু বুলাইছেন?

হ্যাঁ, ডেকেছি। বাজারের কাছে গোপীনাথের দোকান থেকে আড়াইশো গ্রাম মুড়ি, চারটে চারটে করে আলুর চপ, বেগুনি আর ডালবড়া নিয়ে এসো।

চারটো করিয়ে চপ ভি হোলো, বেগোনি ভি হোলো। লেকিন দালবড়া কয়ঠো ভি হোবে?

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন কেদার।

আচ্ছা! 'চারটে' কথাটা দু'বার বলেছি। ডালবড়ার সংখ্যা তোমার ব্যাকরণ অনুযায়ী বাদ হয়ে গেছে। ডালবড়া চারটেই আনতে হবে। বুঝলে দিলানন্দ সিং!

হাঁ হাঁ। শুদ্ধ করিয়ে বাত বোলবেন।

ঠিক আছে বাবা! তুমি একটু শুদ্ধ করিয়ে মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে এসো দেখি। শুদ্ধ করিয়ে খাই।

জরুর, শুদ্ধ ভি হোবে—বলে দিলানন্দ সিং চলে গেলো।

কেদারের মুখোমুখি চেয়ারে বসেছিলেন প্রহ্লাদ চক্রবর্তী। কেদার বললেন, বলুন প্রহ্লাদবাবু, আপনার সমস্যাটা শুনে নিই।

কেদারবাবু, আমি পুরনো জিনিসের সংগ্রাহক। এমন বহু জিনিসই আমাদের বাড়িতে আছে। গতকালই আমার ঘর থেকে একটা রুপোর ফুলদানি চুরি গেছে। ফুলদানিটা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাংলো বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছিলো।

কোন বাংলো বাড়ি থেকে?

রানীগঞ্জের।

সেখানে আবার দ্বারকানাথের বাংলো ছিলো নাকি?

কি যে বলেন! দ্বারকানাথই প্রথম বাঙালি, যিনি ওই অঞ্চলের কয়লা খনির বিজনেসে নেমেছিলেন।

ও গড! বলুন তো একটু, ব্যাপারটা বুঝে নিই।

তক্ষুণি বদ্রীনারায়ণ অফিস ঘরে ঢুকলো। কেদার বললেন, বদ্রী, একটা চেয়ার টেনে বোস। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলছেন প্রহ্লাদবাবু। বদ্রী চেয়ার নিয়ে ওঁদের পাশাপাশি বসে পড়লো।

প্রহ্লাদবাবু বললেন, সতেরোশো আশি সালের কথা বলছি। তখন কয়লা আসতো বিলেত থেকে। তার বেশ কয়েক বছর আগেই জানা গেছে রানীগঞ্জ এলাকায় কয়লা পাওয়া যাবে। সেখানকার দামালিয়া, নারায়ণকুড়ি, এগরা—এসব জায়গা থেকে টুকটাক কয়লা তোলা শুরুও হয়েছিলো।

তখনো বোধহয় সরকারীভাবে সেটা হয়নি?

তা ঠিক। আঠারোশো তেরো সালে বড়লাট লর্ড ময়রার সময়ে খনি এক্সপার্ট উইলিয়াম জন এ-দেশে আসেন। আঠারোশো চৌদ্দ সালের ষোলোই এপ্রিল

উইলিয়াম জন কাজে যোগ দিয়ে কয়লা সন্ধান ও জরিপ শুরু করেন। এর পরেই রানীগঞ্জের পুনিয়া মোড়ের কাছে প্রথম খনির কাজ শুরু হয়।

তারপর?

দেখতে দেখতে বিদেশী খনি কোম্পানিগুলো রানীগঞ্জ এলাকায় জাঁকিয়ে বসে। আঠারোশো তেষট্টি সালে আলেকজান্ডার কোম্পানি ফেল করলে প্রিন্স দ্বারকানাথ সেটি নিলামে কিনে নেন। খনি অঞ্চল নারায়ণকুড়িতে থাকার জন্য তিনি একটি বাংলো বানিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর খনির নাম দিয়েছিলেন 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'।

ওরে ব্বাবা! এতো এক বিরাট ইতিহাস! বদ্রী শুনছিস তো?

বদ্রী হেসে ঘাড় নাড়লো। প্রহ্লাদবাবু ফের শুরু করলেন।

এরপর কেটে গেছে বহুদিন। প্রিন্স দ্বারকানাথও ব্যবসাতে সুবিধে করতে পারেননি। খনিও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'র সেই খনি এলাকা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে। এর পরের ঘটনা বেশি দিনের পুরনো নয়।

কি রকম?

উনিশশো সাতাত্তর সালের কিছু আগে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার পি কে ঘোষ নতুন করে নারায়ণকুড়িতে খনির কাজ শুরু করেন। তিনি দ্বারকানাথের সেই বাংলো বাড়িটিও সরিয়ে-সুরিয়ে তার ভোল পালটে ফেলেন। কিন্তু হঠাৎই তিনি মারা যান। ফলে সেই খনির কাজ শেষ পর্যন্ত একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু দ্বারকানাথের রুপোর ফুলদানিটা এলো কোত্থেকে?

সেই কথাই তো বলবো এবার।

বলুন, শুনি।

বাংলোটি ফের মালিকবিহীন হয়ে পড়ায় পি কে ঘোষের স্ত্রী সেখানকার ব্যবহৃত জিনিসপত্র, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, সোফা ইত্যাদি বিক্রি করে দেন। আসানসোলের অধিবাসী নিশীথ ঘোষ সেই বাংলোয় দ্বারকানাথ ব্যবহৃত তিনটি চেয়ার কিনে নেন। নিশীথবাবুই আমাকে রুপোর ফুলদানিটির কথা জানিয়েছিলেন। সেটি আমি পি কে ঘোষের এক রিলেটিভের কাছ থেকে কিনেছিলাম।

কেমন দেখতে সেটা?

বেশ সুন্দর। একটু চ্যাপ্টা গোছের। পেটটা মোটা। মুখের কাছটা ঢেউ খেলানো। ফুলদানির গলার ঠিক নিচেই দারুণ কারুকাজ করা আছে। সেই ডিজাইনের ফাঁকে ফাঁকে মুক্তোর দানা বসানো।

সেটার কোনো পেয়ার ছিল না?

আছে। ঘোষ মশাইয়ের রিলেটিভ বিশ্ববন্ধু ঘোষের কাছেই আছে। উনি একটি

ফুলদানি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। আমি এত ইন্টারেস্টেড দেখে বিশ্ববন্ধুবাবু একখানাই আমার কাছে বেচে দেন। অবশ্য সেই সময় তাঁর একটু টাকার প্রয়োজন ছিলো।

একটা ফুলদানি বেচে তিনি ক'টাকা পাবেন?

আমি সেটা আট হাজার সাড়ে সাতশো টাকায় কিনেছিলাম। উনি দশ হাজারই চেয়েছিলেন। অনেক দরাদরি করে ওই টাকায় রফা হয়। এত বেশি দামের আরো কারণ আছে।

কি কারণ?

ফুলদানির মুখে ঢেউ খেলানো অংশটার মাথায় সোনার পাত মুড়ে দেওয়া আছে। ওটুকু আলাদা করে বার করলে দশ গ্রামেরও বেশি চব্বিশ ক্যারেটের পাকা সোনা পাওয়া যাবে।

আচ্ছা। এতক্ষণে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো।

বদ্রী এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর কথা শুনছিলো। প্রশ্ন করছিলেন কেদারই। এবার বদ্রীনারায়ণ নড়েচড়ে বসলো। প্রহ্লাদবাবুকে বললো, আমি আপনার কাছে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার জানতে চাইছি। ঠিকঠাক উত্তর দেবেন।

সাধ্যমতো দেবো।

আপনার রোজগারের সোর্স কি? চাকরি না ব্যবসা?

আমি কিছুই করি না। উত্তর কলকাতার বনেদী ধনী পরিবারে আমার জন্ম। শরিকী ভাগাভাগির পর আমার কপালে জুটেছে লাখ পাঁচেক টাকা, সাত মহলা বাড়ির সাড়ে সতেরো ভাগের এক ভাগ, বেশ কিছু ওজনদার গয়নাগাটি ইত্যাদি ইত্যাদি। পোস্টাপিসে রাখা ওই টাকার সুদ পাই হাজার ছয়েক টাকা মাসে। বিয়ে করিনি। অ্যান্টিক কালেকশন, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করতে ভালোবাসি। একটা বড়সড় জাদুঘর বানিয়ে ফেলেছি আমার বাড়িতে। আসবেন একদিন, দেখাবো।

ফুলদানিটা কে নিতে পারে? কাউকে সন্দেহ করছেন কি?

কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারছি না।

ঠিক তক্ষুণি দিলানন্দ সিং মুড়ি-তেলেভাজার ঠোঙা বগলদাবা করে ঘরে ঢুকে পড়লো। কেদার বললেন, আসুন আগে খেয়ে নি। তারপর বাদবাকি কথা হবে। বাপু দিলানন্দ! তোমার ভাগের মুড়ি-তেলেভাজা নিয়ে যাও। আর গোপালদার চায়ের দোকানে আমাদের জন্য লেমন টি বলে এসো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আরও কিছু কথাবার্তা সেরে প্রহ্লাদবাবু চলে গেলেন।

সেদিনই সন্ধেবেলা কেদার প্রহ্লাদ চক্রবর্তীকে একবার টেলিফোন করলেন।

হ্যালো, প্রহ্লাদবাবু নাকি! আমি কেদার মজুমদার বলছি।

আরে, কি সৌভাগ্য! বলুন, বলুন! আমার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলেন কিছু?

একটা কথা জানার ছিলো। আমরা একটু বিশ্ববন্ধুবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাঁর ঠিকানাটা একটু বলবেন?

নিশ্চয়ই! বিডন স্ট্রিটের ওপর মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ দিয়েই একটা ছোট রাস্তা চলে গেছে।

হ্যাঁ।

বিশ্ববন্ধুবাবুর বাড়ি সেই রাস্তার শুরু থেকে গোটা আটেক বাড়ি ছেড়ে। আমার বাড়ির কাছেই। নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি। আমি সঙ্গে যাবো না কি?

না, আপাতত আমি আর বদ্রীই যাবো।

ঠিক আছে। যেমন ভালো বুঝবেন, তাই করবেন।

পরের দিন সকালে কেদার বদ্রীকে বললেন, বদ্রী, তুই কি বাজারে যাবি নাকি?

একটু যেতে হবে। কালকে যাইনি। অন্তত একটু মাছ নিয়ে আসি। না হলে মাসি খেপে যাবে।

ঠিক আছে, যা। আজ একটু বিকেলের দিকে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে যাবি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে যা বইপত্র পাবি, ঘেঁটেঘুঁটে দেখবি। আর দ্বারকানাথের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য আছে এমন বই পেলে ইস্যু করে নিয়ে আসবি।

ঠিক আছে। নিয়ে আসবো।

দুপুরে কেদার-বদ্রী দু'জনে মিলে চুরি যাওয়া সোনায় মোড়া রুপোর ফুলদানির কেস নিয়ে আলোচনায় বসলো। কেদার বললেন, ফার্স্ট রাউন্ডে আমাদের দেখতে হবে, প্রহ্লাদবাবুর ফুলদানি-কাহিনী কতটা বাস্তব আর কতটা গল্প।

কেন? দ্বারকানাথের ফুলদানির ব্যাপারে সন্দেহ করছো নাকি?

করছি। দ্বিতীয়ত, যদি তা সত্যিও হয়, বিশ্ববন্ধু ঘোষ জোড়া থেকে একখানা ওঁর কাছে বেচবেন, এটা একটু অবিশ্বাস্য ঠেকছে এই কারণেই, যে, যাঁরা এসব সংগ্রহ করেন, শত অসুবিধে সত্ত্বেও তা হাতছাড়া করেন না।

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত টানা যাবে না। হতেও পারে, নাও হতে পারে, এরকমই ভাবতে হবে।

হুঁ, ঠিকই।

আর একটু লালবাজারে যোগাযোগ করে অ্যান্টিক বা ওই জাতীয় জিনিসপত্রের কারবারিদের নেটওয়ার্কের খবরও নিতে হবে।

সমস্যাটা হলো, প্রহ্লাদ চক্রবর্তী কোনো এক্স ওয়াই জেডকে সন্দেহ করতে

পারছেন না। ফলে নির্দিষ্ট কোনো একটা সূত্র ধরে এগোনো যাচ্ছে না।

সেইজন্যই বিশ্ববন্ধুবাবুকে ধরে এগোতে হবে।

হ্যাঁ। সোনা ও রুপোর হিসেবে ওই ফুলদানির দাম এখনকার বাজারে মেরেকেটে দশ হাজার টাকা। আর দ্বারকানাথের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেটা পঞ্চাশ হাজারও হতে পারে, এক লাখও হতে পারে। লোক বুঝে যেমন দাঁও মারা যায়।

এগ্‌জ্যাক্টলি তাই!

তাহলে তুই লাইব্রেরিতে বেরিয়ে পড়। আমি সব গুছিয়ে নিই। তুই এলেই বেরিয়ে পড়বো।

বদ্রী কি যেন ভাবছিল। ফুলদানির বিষয়টা ওকে বেশ ভাবাচ্ছে। কেদার যেভাবে ভাবছিলেন, বদ্রী সেভাবে ভাবতে পারছে না। ওর মনে হচ্ছিল, প্রহ্লাদ চক্রবর্তী কোনো বাজে কথা বলেননি। কাজেই শুরু করতে হবে এখান থেকেই। তবে এটা ঠিক যে, গোয়েন্দার সবাইকেই সন্দেহ করতে হবে। কোন জিজ্ঞাসা থেকে যে সঠিক জবাব আসবে তার তো কোনো ঠিক নেই! অতএব সবাইকে সন্দেহ করেই কাজ শুরু করা যাক।

বদ্রী বিকাল পাঁচটা দশে লাইব্রেরি থেকে ফিরে এলো। কেদার বললেন, কি রে, কিছু পেলি না কি?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীটা নিয়ে এলাম। এখানে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন।

ঠিক আছে। আমরা মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে বিশ্ববন্ধুবাবুর বাড়ি থেকে তো একটা চক্কর মেরে আসি। পরে দেখা যাবে কিভাবে এগোনো যায়।

তুমি রেডি তো?

হ্যাঁ।

দু' মিনিটের মধ্যেই রেডি হয়ে নিচ্ছি।

একাশি নম্বর ভজহরি সেন লেন। পলেস্তারা-খসা জীর্ণ চেহারার এই বাড়িটা উত্তর কলকাতার প্রথম যুগের চিহ্ন বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বদ্রী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, কেদারদা, মনে হচ্ছে তিনশো বছর আগে গঙ্গার ঘাটে পা রেখে ইংরেজ বণিক জব চার্নক সূতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা এই তিনটে গ্রামের হদিস পেয়ে সোজা এখানেই চলে এসেছিলেন প্রথম কুঠি বানাতে।

তা যা বলেছিস। একেবারে টিপিক্যাল উত্তর কলকাতা।

ভজহরি সেন লেন একেবারে গলি না হলেও মোটেই চওড়া রাস্তা নয়। আধো-অন্ধকার এই রাস্তায় এসে আধুনিক যুগ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে।

কেদার একাশি নম্বর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে

রইলেন। কেউ দরজা খুললো না। ফের কড়া নাড়লেন। তখনই ওপরের প্রায় ভেঙে পড়া ব্যালকনি থেকে এক নারীকণ্ঠ শোনা গেল—কে! কাকে চাই?

বিশ্ববন্ধুবাবু আছেন না কি? আমরা বাগবাজার থেকে এসেছি।

বদ্রী স্পষ্ট শুনতে পেলো, মহিলা বলছেন, আজ মিন্‌সের কাছে লোকের লাইন পড়ে গেছে। মাড়োয়ারি, হিন্দুস্তানি, বাঙালি—বাপ রে বাপ! কেউ বাদ যাচ্ছে না!

আছেন না কি বিশ্ববন্ধুবাবু?

এবার ব্যালকনিতে এক বৃদ্ধের মুখ দেখা গেলো।—কাকে চাই?

বিশ্ববন্ধু ঘোষের সঙ্গে আমাদের একটু দরকার ছিলো।

কি দরকার?

দ্বারকানাথের ব্যাপারে।

দ্বারকানাথের নাম শুনেই বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। বললেন, হুম্! গুরুতর কিছু ঘটেছে। না হলে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে কেন সবাই!

কেদার-বদ্রী নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলো। কেদার আস্তে আস্তে বললেন, সব পাগল-ছাগলের পাল্লায় পড়লাম না কি!

বদ্রীনারায়ণ বৃদ্ধের মন্তব্য শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। রহস্যের গন্ধ পেলো সে। মনে হলো, কিছু একটা ঘটবেই এখানে। তখনই ওপরে ব্যালকনিতে বৃদ্ধের গলা পাওয়া গেলো।

ও পেঁচি! সদর দরজাটা খুলে দিয়ে আয়। ওদের তিনতলায় চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে যা।

দেড় মিনিটের মাথায় 'ঝরং-ঝরং' আওয়াজ তুলে সদর দরজা খুলে গেলো। এমনই দরজার অবস্থা, যে কোনো মুহূর্তে খুলে পড়ে যাবে মনে হয়।

তবুও যেন এক অদৃশ্য শক্তি ওটাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এক বিধবা মহিলা, সাদা থান পরা, দরজার পাল্লা দু'টো ধরে দাঁড়িয়ে। কেদার-বদ্রীকে সম্বোধন করে বললো, ভেতরে আসুন!

কেদার-বদ্রী ভেতরে ঢোকামাত্রই মহিলা দরজা বন্ধ করে দিলো। ওই রকমই সব কিছু ভেঙেচুরে পড়ে যাওয়ার মতো 'ঝরং-ঝরং' শব্দ উঠলো ফের। তারপরই বলতে গেলে অন্ধকার।

বদ্রীর দেখতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিলো না। অন্ধকারে যেন সে আরো ভালো দেখতে পায়। পেঁচি নামের সেই সাদা থান পরা মহিলাটি খ্যানখেনে গলায় বললো, আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। না হলে হোঁচট খাবেন। গর্ত আছে। কেদার অবাক হয়ে বললেন, গর্ত? মহিলাটি হি-হি করে হেসে বললো, বড় বড় গর্ত মোশাই! এ-বাড়িতে বড় বড় গর্ত আছে।

হঠাৎ বদ্রী কেদারকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে অস্ফুটে বলে উঠলো, সাবধান কেদারদা।

সত্যিই সামনে একটা গর্তের মতো। মহিলাটি সেটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বলেছিনু না, গর্ত আছে! সাবধানে আসতে হবে।

কেদার ভাবছিলেন, আচ্ছা পাগল যা হোক!

বদ্রী ভাবছিলো, এখানেই ফুলদানি-রহস্য লুকিয়ে আছে। বদ্রীর অবচেতন মনের ভেতর অজস্র চিন্তার ঢেউ জেগে উঠছিলো, আর মিলিয়ে যাচ্ছিলো।

হ্যাঁ, এই সিঁড়ি ধরে বরাবর ছাতে চলে যান। ছাতের চিলেকোঠায় দাদুকে পেয়ে যাবেন। বলে মহিলাটি কেদার বদ্রীকে সামনের সিঁড়ি দেখিয়ে দিলো।

ওরা কালবিলম্ব না করে আধো-অন্ধকার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলো। বিধবা মহিলাটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় ওঠার সিঁড়িতে ঘোর অন্ধকার। পা টিপে টিপে দু'জনে ওপরে উঠছে!

এতো অন্ধকার, আর এবড়ো-খেবড়ো চটা ওঠা সিঁড়ি, যে, তাড়াতাড়ি করে ওঠার উপায় নেই। তা হলে হোঁচট খেতে হবে। দেওয়ালেও মাথা ঠুকে যেতে পারে।

কে যেন হা-হা করে হাসছে। বদ্রী কান খাড়া করলো। বদ্রী কেদারের হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বললো, কেদারদা, খুব আস্তে আস্তে ওঠো। সাবধান! রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি!

ছাদে ওঠার মুখে এসে বদ্রী কেদারের হাতটা ফের চেপে ধরে একটু দাঁড়াতে বললো। ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

এখন প্রচুর আলো। ছাদের খোলা দরজা দিয়ে আলো ঢুকছে এখানে। ছাদের ডানদিকে চিলেকোঠার ঘর দেখা যাচ্ছে।

সেখান থেকেই হাসির শব্দ আসছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে কেউ। আর একজন শুধু কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে।

ওরা ছাদে উঠে এলো। ধীর পায়ে চিলেকোঠার কাছে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। দু'জন কথা বলছে। একজন আধা বাংলা, আধা হিন্দীতে কথা বলছে।

তা হলে বিশ্বোনধুবাবু, এহী বাত পাক্কা হোলো। মাল মিল জায়েগা তো আপনি তিস হাজার পেয়ে যাবেন।

দেখুন মশাই ঠনঠনিয়াজী, আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না। দশ-বিশ হাজার এককালে বহু নাড়াচাড়া করেছি। আজ হাতি কাদায় পড়েছে, তাই চামচিকেও লাথি মেরে চলে যাচ্ছে।

হা-হা করে অট্টহাসি হাসলো ওই অবাঙালি লোকটা। কি যে বোলেন দাদা! হামি

চামচিক্কা নেহী আছে। হামার নাম আছে সূরজমল নাফাবাজ ঠনঠনিয়া। রোবিন্‌দনাথ টেগোরকো হামি যাদা রেসপেক্ট করি। ইস লিয়ে, যো টেগোর সাহাব বড়িয়া বিজনেসম্যান থা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় বিজনেসম্যান ছিলেন? কোত্থেকে এ-খবর জোগাড় করলেন? তাও কিনা আপনার মতো নাফাবাজের কাছ থেকে আমাকে শুনতে হবে!

শুনুন, শুনুন! নাফা ছোড়কে হামি আওর কুছ সমঝাতে পারি না। জিসমে নাফা নেহি, কোই আদমী ওহি কাম কিঁউ করেগা? এহি তো সাচ বাত!

সাচ বাত, ফাচ বাত বুঝি না। শুনুন ঠনঠনিয়াজী! আপনি যে জিনিসটা চাইছেন, সেটা কোথায় আছে আমি বলে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি দয়া করে এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম টেনে আনবেন না। ওঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

ঠিক হ্যায়। কোই বাত নেহি। বিশ্‌বোনধুবাবু, তো হোলে আপনি হামাকে ওহি অ্যাড্‌ড্রেসঠো ভি বাতলিয়ে দিন। হামি খবর লাগিয়ে মাল ঢুন্‌ডে লিচ্ছি।

কাগজ কলম আছে তো লিখে নিন। যত্তো সব!

হাঁ, হাঁ। কাগজ ভি হ্যায়, কলম ভি হ্যায়। আপ বাতাইয়ে।

লিখুন।

খানসামাপাড়া, চন্দননগর, হুগলী।

হাঁ, বহুৎ আচ্ছা। কীভাবে যেতে হোবে আপনার মালুম আছে?

অত মালুম টালুম নেই! আমার অত ইন্টারেস্টও নেই। এবার ভাগুন তো! যত্তো সব বেমক্কা লোকজন। বলে কিনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালো ব্যবসাদার ছিলো! আমার মেজাজটা একেবারে তিরিক্ষে করে দিয়েছেন ওই একটা কথাতেই।

গুস্‌সা মাৎ কোরেন বিশ্‌বোন্‌ধুবাবু। লেকিন ইয়ে বাত তো সাচ ই থা। মার্কিটমে ইয়ে বাত তো চলতা ফিরতা রহা।

কোন বাত চলতা-ফিরতা হ্যায় শুনি?

রোবিন্‌দনাথ টেগোর শান্তিনিকেতোন বনায়া?

হ্যাঁ বানিয়েছেন।

উহাঁ পর ছাত্তিম ট্রি ভি লাগায়া?

শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলা তো আছেই! তাতে ব্যবসার কি সম্পর্ক মশাই?

আরে বাত তো ওহি হ্যায়। ছাত্তিমতল্লামে বৈঠ কর টেগোর সাহাবজী আসমান দেখতা রহতা থা রাত মে। চান্দ ভি, আই মিন মুন দেখতা থা, অ্যান্ড পোয়েট্রি লিখতা থা।

তা কী হয়েছে! রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখবেন না তো কি আপনি কবিতা লিখবেন?

আরে তওবা তওবা। ওইসি বাত নেহি। বাত এহি হ্যায় যো, টেগোর সাহাবজী

নে চন্দ্রমাকো দেখতে দেখতে পোয়েট্রি লিখতা থা। অ্যান্ড ইস পোয়েট্রি কো কিতাব মার্কেটমে বেচতা থা। কোই ইনভেস্টমেন্ট নেহি। পুরা হি পুরা নাফা। ক্যায়া জী? হাম ক্যায়া ঝুট বাত বোলা?

এবার চিলেকোঠার বাইরে থেকে হা-হা, হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন কেদার মজুমদার। এবং কাউকে কোনোরকম বুঝতে না দিয়ে সোজা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আমরা একটু বিশ্ববন্ধুবাবুর কাছে এসেছি। ওঁকে খুবই দরকার।

কি ব্যাপারে?

আজ্ঞে, আমি দৈনিক যুগবার্তা কাগজের স্টাফ রিপোর্টার। অ্যান্টিকের ওপর আপনার কাজকর্মের ব্যাপারে আমরা একটু লিখতে চাই।

আসুন, আসুন। তা'হলে ঠনঠনেবাবু, নমস্কার। পরে দেখা হবে।

নাফাবাজ ঠনঠনিয়া চলে গেলে কেদার বিশ্ববন্ধুবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রলোক কে? কি করতে এসেছিলেন?

বললো তো কি ঠনঠনিয়া না ফনঠনিয়া! এসেছিলো প্রিন্স দ্বারকানাথের ব্যবহার করা একটা রুপোর ফুলদানির খোঁজ করতে।

কথাটা শুনেই কেদারের চক্ষু চড়কগাছ। বদ্রী চুপ। বদ্রী ভাবছিলো, আমি এরকমই আশা করেছিলাম। কিন্তু বদ্রী কি ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কেদারকে বললো, কেদারদা, আমাদের এক্ষুণি এঁকে সবটা জানাতে হবে। তুমি ব্যাপারটা খুলে বলো বিশ্ববন্ধুবাবুকে।

তুই এতো তাড়াহুড়ো করছিস কেন? কী হয়েছে?

এখন কটা বাজে?

সাড়ে ছ'টা।

হাওড়া থেকে চন্দননগর যেতে ট্রেনে কতক্ষণ লাগে?

ম্যাক্সিমাম ঘণ্টাখানেক।

ঠিক আছে। আমরা বিশ্ববন্ধুবাবুর সঙ্গে কথা সেরে নিই।

দু'জনের কথাবার্তার মাঝখানে বৃদ্ধ বিশ্ববন্ধু ঘোষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। কেদার মনে মনে ঠিক করলেন, অতর্কিতে ধাক্কা দেওয়া কথাবার্তা বলতে হবে। স্পিডের সঙ্গে জেরা করতে হবে। কেদার ভাবতেই পারেননি এত শিগগির একটা আলটপকা ঘটনায় সূত্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন। তার মধ্যে আবার বদ্রীনারায়ণ যেভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে, কেসটা খুব দ্রুতই পরিণতির দিকে চলে যাবে। কেননা, বদ্রী কখনোই ফালতু কথা বলে না। যাই হোক,

কেদার এবার বিশ্ববন্ধুবাবুর সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিলেন।

বিশ্ববন্ধুবাবু! যে কারণে আপনার কাছে এসেছি, সেটা খুলেই বলি।

কি কারণে এসেছেন?

চটপটই বলে ফেলি। কারণ আমাদের আপনার সাহায্য দরকার হবে। তা আপনি প্রহ্লাদ চক্রবর্তীকে চেনেন তো?

চিনবো না! প্রহ্লাদ তো ভারি শৌখিন মানুষ।

প্রহ্লাদবাবুকে তো আপনি দ্বারকানাথের রুপোর ফুলদানির একটা বেচেছেন।

আপনি জানলেন কি করে?

প্রহ্লাদবাবুর সেই ফুলদানিটা চুরি গেছে।

বলেন কি! কবে চুরি হলো? আহা-হা। ইস! কি করতে ফুলদানিজোড়া আমি হাতছাড়া করলাম!

জোড়া কেন? আপনি কি আরেকটাও কাউকে দিয়ে দিয়েছেন না কি?

হ্যাঁ। চন্দননগর খানসামাপাড়ার জীবেন বিশ্বাসের কাছে বাইশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি। খুব টাকার দরকার মশাই আমার। নিজের ক্যান্সার হয়েছে। আমার এই বাড়িটারও ক্যান্সার হয়েছে। এখানে সেখানে গর্ত। জানালা-দরজাগুলো যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ে যাবে। অবশ্য প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর কাছে অন্যায্য দামে ওটা বিক্রি করিনি।

জানি। ওটা আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করেছিলেন প্রহ্লাদবাবুর কাছে।

প্রহ্লাদ বলেছে বুঝি?

ঠিকই ধরেছেন।

এবার বদ্রীনারায়ণ বিশ্ববন্ধুবাবুর মুখোমুখি হলো। আসলে ওর আর তর সইছিলো না। খুব দ্রুত এগোতে হবে। ও কথা শুরু করলো।

বিশ্ববন্ধুবাবু, ইনি হচ্ছেন গোয়েন্দা কেদার মজুমদার। আর আমি হচ্ছি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি। প্রহ্লাদবাবু তাঁর চুরি যাওয়া ফুলদানি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের নিযুক্ত করেছেন। এ-ব্যাপারে কিছু জানা যায় কিনা সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

আরে এই ঠনঠনিয়াও তো প্রথমে প্রহ্লাদের ফুলদানির খবর আর তার বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে গিয়েছিলো আমার কাছ থেকে!

আর আজকে জেনে নিলো চন্দননগর খানসামাপাড়ার জীবেন বিশ্বাসের ঠিকানা। তাই তো?

ঠিক তাই।

তা হলে আপনি এটা বুঝতে পারছেন তো, যে এই ফুলদানি-জোড়ার ওপর কারোর নজর পড়েছে!

হুঁ, সেটাই মনে হচ্ছে।

বদ্রীর নীল চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ওর অবচেতন মনে ভেসে উঠলো একটা প্রশ্ন। সেই প্রশ্নই সে ছুঁড়ে দিলো বিশ্ববন্ধু ঘোষের দিকে।

আচ্ছা আপনি কি বলতে পারেন, এই ফুলদানিজোড়ার বিশেষত্ব কি? একে কেন্দ্র করে কোনো মিথ চালু আছে কি না?

বিশ্ববন্ধুবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন। বদ্রীর মনে হলো, উনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, মিথের ব্যাপারটা বলবেন কি বলবেন না। তাই বদ্রী তার স্বভাবসিদ্ধ নরম ভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে বৃদ্ধকে ঝাঁকানি দেবার জন্য বললো, বিশ্ববন্ধুবাবু! আপনার ঠিকঠাক কথার ওপরই নির্ভর করবে প্রিন্স দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত ফুলদানিজোড়ার ভবিষ্যৎ।

ঠিক আছে। বলছি। ভারতে উপনিবেশ গড়তে ফরাসি সেনাধ্যক্ষ মার্শাল দুপ্লে চন্দননগরে কুঠি করে সামরিক অভিযান অথবা বাণিজ্য বাড়াবার প্রত্যাশায় ছিলো। আর ছিলো দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভের কাছে হেরে গিয়ে মার্শাল দুপ্লের ভারত জয়ের আশা ছাড়তে হয়। এই জোড়া-ফুলদানি নাকি মার্শাল দুপ্লের ড্রইংরুমে শোভা পেতো।

লোকমুখে এই কথাটা চালু আছে যে, এই ফুলদানি দু'টো যতদিন দুপ্লের কাছে ছিলো, ততদিন তার ভাগ্য ছিলো ঊর্ধ্বমুখী। কোনো কারণে ওটা দুপ্লের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর পতন শুরু হয়ে যায়। যাই হোক, কোনো ইংরেজ বণিকের হাত ঘুরে সেই জোড়া ফুলদানি প্রিন্স দ্বারকানাথের হাতে এসে পৌঁছোয়। এ-ক্ষেত্রেও কথিত আছে, ফুলদানি দু'টো যতদিন তাঁর কাছে ছিলো, ততদিন সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর ঘরে বিরাজমান ছিলেন। রানীগঞ্জে কয়লাখনির ব্যবসায় নেমে তিনি ওখানে একটা বাংলো বানিয়েছিলেন। ফুলদানি দু'টি সেখানে তিনি নিয়ে যান। সেখান থেকে ওই দু'টো খোয়া যায়। তারপরেই নাকি তাঁর ব্যবসা ফেল পড়ে যায়।

এই হলো ব্যাপার। তা এই ঠনঠনিয়া ফুলদানি দু'টো খুঁজছে কেন?

কোনো এক ফরাসি সাহেব নাকি ওই জোড়া ফুলদানির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বোঝা গেল। আপনি বিশ্বাস করে আমাদের সব বললেন, এ-জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই নিন আমাদের ভিজিটিং কার্ড।—বলে কেদার 'উদিতভানু ইনফরমেশন'-এর একটা কার্ড দিয়ে দিলেন।

প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবো। শুধু এটা কি আপনি



রহস্যময় সেই ফুলদানিটি

বলতে পারেন, চন্দননগর খানসামাপাড়ায় জীবেন বিশ্বাসের বাড়ি কত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়?

হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল লোকালে উঠে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই চন্দননগর স্টেশনে পৌঁছে যাবেন। ওখান থেকে খানসামাপাড়া রিকশায় যেতে পাঁচ-সাত টাকা ভাড়া নেবে। এখন একটু বাড়তে পারে। এই পাড়ার সবাই খ্রীষ্টান। এদের বাপ-ঠাকুরদারা ফরাসি আমলে তাদের খানসামার কাজ করতো। তখনই এরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

জীবেন বিশ্বাস সম্পন্ন খ্রীষ্টান। ওই মিথ মাথায় রেখেই জীবেনবাবু বাইশ হাজার টাকায় একটা ফুলদানি কিনে নিয়ে যান।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেদার উঠে পড়লেন। বদ্রী দাঁড়িয়েই বললো, বিশ্ববন্ধুবাবু, বুঝতেই পারছেন, আপনি ঠনঠনিয়াকে জীবেন বিশ্বাসের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। সে চন্দননগরে গিয়ে সেটা হাতাবার চেষ্টা করবে। আমার মনে হচ্ছে, সে আজকেই ওখানে চলে যাবে। এই রকম একটা ঐতিহ্যশালী মূল্যবান জিনিস নিয়ে কোনো মুনাফাখোর ব্যবসায়ী কয়েক লাখ টাকা কামিয়ে নেবে, সেটা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

এটা ঠিকই বলেছো বাবা। সে আবাব বলে কিনা আমাদের রবিঠাকুর বিনা পুঁজিতে ব্যবসা করতেন! তিনি নাকি চাঁদ দেখতেন আর কবিতা লিখতেন! তাই ছেপে বাজারে বেচতেন!

তা হলেই বুঝুন, এইসব অর্থলোভী বাজারী লোকেদের কারবারটা কেমন ধরনের! তার ওপর এই মূল্যবান ফুলদানিদু'টো যদি কোনো ফরাসি সাহেবের হাতে পড়ে বিদেশে চলে যায়—

তা হলে তো একেবারে ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে যাবে!

সুতরাং আমরা উঠি এবারে। ফুলদানিদু'টো যে কোনো মূল্যে বাঁচাতে হবে। শুধু আমরা যে এসেছিলাম এ-কথা কাউকে বলবে না।

অবশ্যই, অবশ্যই!

উদিতভানুতে ফিরে এসে কেদার লালবাজারে টেলিফোন করে অ্যান্টিক বা দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর চোরাকারবারিদের নামধাম আর ওদের নেটওয়ার্ক মোটামুটি জেনে নিলেন। দু'একটা ব্যাপারে খোঁজ নেবারও অনুরোধ করলেন। টেলিফোন রাখামাত্রই বদ্রী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীটা হাতে করে নিয়ে এসে বললো, কেদারদা, প্রিন্স দ্বারকানাথ সম্বন্ধে কি লিখেছে শোনো। পড়ছি।

কি লিখেছে? পড় তো!

তিনি লিখেছেন, 'আঠারোশো চৌত্রিশ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর আরও স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সরকারী চাকুরিটি (কাস্টমস, সল্ট ও ওপিয়ম বোর্ডের দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন।'

ঠিক আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে আমার বেশি একটা কিছু জানা ছিলো না। পরে পুরো বইটা পড়ে নেবো। সব কিছু রেডি? আমরা রওনা দিতে পারি?

হ্যাঁ। অবশ্যই।

ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল চন্দননগর স্টেশনে এসে পৌঁছলো রাত ন'টা সাতচল্লিশ মিনিটে। কেদার এবং বদ্রী প্লাটফর্ম থেকে নিচে নেমে একটা রিকশায় উঠেই বললো, থানায় চলো।

থানায় ওরা সাকুল্যে দশ মিনিট সময় খরচ করলো। ও সি নিরাপদ দাসকে কেদার-বদ্রী ওদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলো। এই মুহূর্তে কোনোভাবেই যে সময় নষ্ট করা যাবে না, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে কেদার বললেন, আমরা একটা রিকশা নিয়ে খানসামাপাড়ায় জীবেন বিশ্বাসের বাড়ি চলে যাচ্ছি। এক্ষুণিই। মিস্টার দাস, আপনি কাইন্ডলি যদি পারেন, দু'তিনজন আর্মড কনস্টেবল পঠিয়ে দিন আমাদের পেছু পেছু। আমরা আসি।

ও সি-র উত্তরের অপেক্ষায় রইলো না কেদার বদ্রী। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো ওরা।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেলো চন্দননগরের রাস্তায় কেদার-বদ্রীকে নিয়ে একটা রিকশা ঊর্ধ্বশ্বাসে পৌরভবনের দিকে ছুটে চলেছে। আসলে পৌরভবনের কাছেই খানসামাপাড়া। কেদার রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, বলতে পারো, জীবেন বিশ্বাসের বাড়িটা কোথায়?

আমি ঠিক বলতে পারবো না দাদা। এই মোড়ে নামিয়ে দিচ্ছি। ওই চায়ের দোকানে জেনে নিন।

বদ্রীর মন তখন ছুটে চলেছে তার শরীরের অনেক আগে।

খানসামাপাড়ার একেবারে শেষ মাথায় জীবেন বিশ্বাসের বাড়ি। এখন বাজে রাত দশটা চল্লিশ। এমনিতেই শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটু ভেতরে। এই রাতে মানুষজনের চলাফেরা কম। তার ওপর জীবেন বিশ্বাসের বাড়িটা যেন আরো চুপচাপ। এই নৈঃশব্দ্য দেখে বদ্রীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ফিসফিস করে ও বললো, কেদারদা, সাবধান! ঠনঠনিয়াদের মতো ক্যারেক্টারের লোকেরা টাকার জন্য সব কিছু করতে পারে। আমার মনে হচ্ছে, অনেক আগেই সে এ-বাড়িতে পৌঁছে

গেছে।

পৌঁছে যাক। আসলে কিভাবে পৌঁছেছে সেটাই হলো বড় কথা। কী মূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে, সেটাও প্রশ্ন। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, ওরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলো কিনা!

ঠিক তক্ষুণি বাড়ির ভেতর থেকে পুরুষকণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে এলো। সদর দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে কেদার-বদ্রী বাড়ির দেওয়ালের আড়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। কেদার তাঁর প্যান্টের ভেতরে কোমরের কাছে রাখা কোল্ট রিভলবারটা একবার হাত দিয়ে পরখ করে নিলেন। ঠিক আছে। এবার আড়ালে থেকেই সদর দরজা ঠেলা দিলেন। দরজা বন্ধ। বদ্রীকে বললেন, দরজা বন্ধ রে!

আমরা পেছন দিয়ে যে কোনো উপায়ে ঢুকবো। বাইরে থেকে দরজার ছেকলটা তুলে দাও তা'হলে। অন্ততঃ এর জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

কেদার আস্তে করে দরজার ছেকল তুলে দিলেন। বদ্রী বললো, কুইক! ভেতরে ঢুকবার একটা জায়গা খুঁজতে হবে। বাড়ির পেছনে যাই চলো!

বাড়ির পেছন দিকে একটা ডুমুর আর দু'টো কৃষ্ণচূড়া গাছ। বেশ অন্ধকার এখানটা। ওপাশের স্ট্রিটলাইটের আলোর একটা তির্যক রেখা দু'টো বাড়ির মাঝখান দিয়ে সামান্য জায়গা করে নিয়ে আছড়ে পড়েছে জীবেন বিশ্বাসের বাড়ির পেছনটায়। ও-টুকুই যা আলো।

ক্যারাটে মাস্টার কেদার মজুমদার দেরি করলেন না। যে কৃষ্ণচূড়া গাছটা একেবারে পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেই গাছের ডালের জোর কতটা তাই পরখ করে নিলেন। এবার ডালটা ধরে সামান্য ঝুলে প্লাস্টার-খসা পাঁচিলের ইঁটের খাঁজে পা রাখলেন। গাছটা অবশ্য একটু জোরেই নড়ে উঠলো। কেদার কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ রইলেন। এরপর ইঁটের খাঁজে ডানপায়ের ভর রেখে একটু লাফিয়ে পাঁচিলের মাথা দু'হাতে ধরে ফেলে সরীসৃপের মতো ঝট্ করে সেখানে উঠে পড়লেন। গুঁড়ি মেরে বসে রইলেন দু'এক সেকেন্ড।

বাড়ির ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পাঁচিল ঘেঁষে একটা জলভর্তি চৌবাচ্চা। তারপর একটা পাতকুয়ো, তার পাশেই বাথরুম। কেদার ভাবলেন, ভালোই হলো। এখানে আপাতত কেউ নেই। বদ্রীকে আস্তে করে বললেন, এই! গাছের ডালটা ধরে ঝুলে পাঁচিলের খাঁজে পা রাখ।

বদ্রী তাই করলো। কেদার বদ্রীকে টেনে তুলে নিলেন। বললেন, বদ্রী, বোধহয় একটুও দেরি করা যাবে না। আমি আগে নামছি।

চৌবাচ্চার দেওয়ালে পা রেখে কেদার এক ধাপ নামলেন। বদ্রী একইভাবে সেখানে এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে নিঃশব্দে নেমে এলো পাতকুয়োর পাশে।

কেদার বাথরুমের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। বদ্রী বললো, এক মিনিট।

বাথরুমে উঁকি দিয়েই বদ্রী দাঁড়িয়ে পড়লো। ইশারায় ডাকলো কেদারকে।

কি হয়েছে?

এসো না এদিকে! কেদার পিছিয়ে এসে বাথরুমে উঁকি দিলেন। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় একটি কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক দলা মোচড়া অবস্থায় পড়ে আছে। কেদার বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। যুবকের মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে কেদার ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললেন। বললেন, আমরা পুলিসের লোক। কোনো ভয় নেই।

আতঙ্কে যুবকের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। বদ্রী পকেট থেকে ছুরি বের করে তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলো।

বদ্রী জিজ্ঞেস করলো, ক'টা গুণ্ডা বাড়িতে ঢুকেছে?

চারজন।

কেদার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? বাড়িতে আর কে কে আছে?

আমার নাম হরেন বিশ্বাস। দাদা জীবেন বিশ্বাস, বৌদি আর দাদার চার বছরের মেয়ে শিল্পী বাড়িতে আছে। বৌদি আর মেয়েটাকে বেঁধে রান্না ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দাদাকে খুব মেরেছে। আলমারি আর শো-কেসের চাবি চাইছিলো ওরা।



বাথরুমে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় একজন পড়ে আছে

আমরা তিনজন, ওরা চারজন। লড়তে পারবে তো? ভয় নেই। বাড়ির বাইরে বন্দুকধারী পুলিস আছে। কোন ঘর কোন দিকে আছে, বুঝিয়ে দাও।

হঠাৎ বদ্রী অস্ফুটে চিৎকার করলো. কেদারদা! সাবধান! পায়ের শব্দ!

কেদার লাফ দিয়ে পাতকুয়োর আড়ালে গিয়ে বসে পড়লেন। হরেন ঘোষ আর বদ্রী বাথরুমের বাঁ পাশে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছিলো। একজনই বোধহয় দেখতে এসেছে, হরেন পালালো কিনা। লোকটা পাতকুয়োর শান বাঁধানো চত্বরে এসে দাঁড়ালো। দেখলেই বোঝা যায়, পেশাদার গুণ্ডা। সম্ভবত ঠনঠনিয়াই এদের ভাড়া করেছে। সতর্ক পা ফেলে লোকটা বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। এদিকে কেদারের সমস্ত স্নায়ু সক্রিয় হয়ে উঠেছে। লোকটা বাথরুমের দরজা সামান্য খুলে উঁকি দেওয়ামাত্রই কেদার বসা অবস্থাতেই শরীরটাকে উড়িয়ে দিলো গুণ্ডাটার পা লক্ষ্য করে। আচমকা পায়ে আঘাত পেয়ে লোকটা দড়াম করে শান বাঁধানো চত্বরে পড়ে গেলো।

আ-আ শব্দে আর্তনাদ করে ওঠামাত্রই কেদার ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরে পেটের মধ্যে যন্ত্রের মতো ডজনখানেক ঘুষি চালিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলো গুণ্ডাটা।

বদ্রী আর হরেন ঘোষ ততক্ষণে আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর্তনাদ শুনে বাড়ির ওপাশ থেকে কেউ ছুটে আসছে। বদ্রী বললো, সাবধান! হরেন বললো, এদিক দিয়ে আসুন। এই ছোট দরজাটা খুললে আমরা উঠোনে চলে যেতে পারবো। ওরা চটপট তাই করলো। ওপাশ থেকে বাথরুমের পাশের ছোট দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত দু'টো লোক বাথরুমের কাছে ছুটে এসেছিলো। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা ওদের সঙ্গীকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ওরা ছুটলো ফের বাড়ির ভেতর দিকে। উঠোনে ঢুকবার মুখেই ক্যারাটে মাস্টার কেদারের হাত-পায়ের খেল শুরু হয়ে গেলো। খেল মানে খেল। এ-যেন একেবারে ম্যাজিক!

কেদার আড়াল থেকে তাঁর ডান পা-টা আচমকা বাড়িয়ে দেওয়ামাত্রই পা জড়িয়ে দু'জনে হুমড়ি খেয়ে উঠোনে পড়ে গেলো। একজন উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কেদারের ডান পা শূন্যে একপাক ঘুরে তার কপালের স্নায়ুতে মোক্ষম আঘাত হানলো। ক্যারাটের এই মারটা সাঙঘাতিক! স্নায়ুর সঠিক জায়গায় আঘাত লাগলে ব্যথার অনুভূতি আসার আগেই সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রেও লোকটা এক লহমার মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর ওঠার নামই নেই! দ্বিতীয় লোকটা হাল সুবিধের নয় দেখে পেছন দিকে ঘুরে পালাবার ফিকির খুঁজছিলো। এবার তার ওপর যমের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো হরেন বিশ্বাস।—পালাবি কোথায়! আমার দাদা-বৌদির গায়ে হাত

তুলেছিলি না! মেরেই ফেলবো তোকে! দু'জনের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো কুস্তির লড়াই।

কেদার দেখলেন, হরেন এই লোকটাকে সামলে নেবে। তাই বদ্রীকে বললেন, কুয়োতলায় যে ব্যাটা পড়ে আছে, ও ব্যাটাকে হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়ে আয়। ওর এখনো জ্ঞান ফিরতে মিনিট কুড়ি লাগবে।

বদ্রী ছুটলো কুয়োতলার দিকে।

হরেন যে লোকটাকে চেপে ধরেছিলো, সেই লোকটা হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলো। বোধহয় হরেন এমন জোরে হাত মুচড়ে দিয়েছে, যে লোকটার কনুইয়ের জোড় ভেঙেই গেছে। কারণ কেদার মট করে একটা শব্দ পেয়েছিলেন।

লোকটা এবার মাটিতে পড়ে ডান হাতের কনুই চেপে ধরে গোঙাচ্ছে। তাই দেখে কেদার চুক্-চুক্ শব্দ করে বললেন, আহা খুব লাগছে? তা বাপু, লোকের বাড়িতে ঢুকে গুণ্ডামি লুঠতরাজ করলে ফল তো ভোগ করতেই হবে!

বদ্রী কুয়োতলা থেকে ফিরে এলো। বললো, কেদারদা, হারাধনের তিন ছেলে কাবু।

রইলো বাকি এক।

কেদার উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, শিগগির! বাচ্চাটা রয়েছে, বাচ্চার মা রয়েছে ওদিকে!

কেদার, বদ্রী আর হরেন তিনজনেই বড় ঘরের দিকে ছুটলো।

খবরদার! আর একটুও এগোবে না! গুলি চালিয়ে দেবো!

কেদাররা তিনজন থমকে গেলো। হরেন এগিয়ে যাচ্ছিলো। কারণ সে প্রচণ্ড রাগে টগবগ করে ফুটছিলো। কেদার তাকে আটকালেন।

দরজার আড়াল থেকে একটা দেশী পিস্তল ডানহাতে ধরে বেরিয়ে এলো একটা কুৎসিৎ দর্শন লোক। চোখগুলো লাল-হলুদের সংমিশ্রণে বীভৎস, ভয়ঙ্করভাবে জ্বলছে যেন। ঠোঁটগুলো মোটা। বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা। হাতের পেশিগুলো ফোলা ফোলা। চওড়া বুক। লোকটা ফের চিৎকার করে উঠলো।

সব ওই বারান্দার কোণের দিকে চলে যাও! তাড়াতাড়ি! জলদি করো!

কেদার দেখলেন, লোকটার বাঁ হাতে চটের বস্তায় মোড়া একটা জিনিস। কী সেটা? বদ্রীও দেখেছে। বদ্রী ভাবছিলো, ওটা অবশ্যই সেই ফুলদানি।

অ্যাই, সব ওই কোণে গিয়ে দাঁড়াও! বলে সেই ভয়ঙ্কর লোকটা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ডানদিক ধরে আস্তে আস্তে সদর দরজার দিকে এগোতে লাগলো।

কেদার লোকটাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার স্যাঙাৎদের নিয়ে যাবে না?

লোকটা চিৎকার করে উঠলো—চওপ! কোনো কথা বলবি না!

কেদার-বদ্রী দু'জনেই বুঝতে পারলেন, লোকটা দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। কোনোরকমে পালাতে পারলেই বাঁচে। সঙ্গীরা মরুক-বাঁচুক তাই নিয়ে ওর কোনো মাথা ব্যথাই নেই।

হরেন বিশ্বাস রাগে ছটফট করছিলো। সেই শুধু বলে চলেছে, লোকটা তো পালিয়ে যাবে!

কেদার বললেন, পালাক না! তিনটেকে তো ধরেছিই!

লোকটা ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়েই রেখেছে। কেদারদের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে সে সদর দরজার কাছে চলে এসেছে এতক্ষণে। সে আবার হাঁক ছাড়লো—কেউ এক পা এগোবে না। নড়লেই গুলি চালাবো!

ডান হাতে পিস্তল, চোখ কেদার-বদ্রী-হরেনের দিকে। বাঁ হাতে চটের প্যাকেটটা ধরা অবস্থাতেই সে দরজার খিল খুলে ফেললো। আবার হুঙ্কার ছাড়লো, কেউ নড়বে না!

লোকটা দরজা ধরে আস্তে টান দিলো। দরজা খুললো না। জোরে টান দিলো। খুললো না দরজা। মরিয়া হয়ে সে কেদারদের দিকে পেছন ফিরে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় হ্যাঁচকা টান দিলো। তবুও দরজা খুললো না। ভীত, ক্ষিপ্ত, মরিয়া গুণ্ডাটা ফের কেদারদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

এদিকে দরজা ধরে টানাটানির ওটুকু সময়ের মধ্যেই কেদার তাঁর পকেট থেকে রিভলবার বের করে ফেলেছেন।

গুণ্ডাটা ওদের দিকে ফের পিস্তল তাক করে চিৎকার করে ওঠার সময়েই দেখলো, কেদারও তার দিকে রিভলবার তাঁক করে আছেন। কেদার চিৎকার করলেন, পিস্তল ফেলে দাও!

লোকটা হাতের পিস্তল ফেললো না। তার সে ইচ্ছেও নেই। সে ভাবছিলো, এখন কি করা যায়। কেদার চাইছিলেন, গুণ্ডাটার মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে।

কেদার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জীবেনবাবু আর তার বউ-মেয়েকে কোন ঘরে আটকে রেখেছো? তুমি পালাতে পারবে না। পিস্তল ফেলে ধরা দাও!

কেদারের কথা শুনে লোকটা কুটিল হাসি হাসলো। চিৎকার করে বললো, তুমি পিস্তল ফেলে দাও! না হলে তোমরা মরবে, আমিও মরবো! বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করলেই কি আমি ধরা দেবো না কি!

কেদার বুঝলেন, এ-সব কথায় এই টাইপের খুনে গুণ্ডা নার্ভাস হবে না। কথা বলে সময় নষ্ট করে প্ল্যান কষতে হবে।

কেদার তাঁর কোল্ট রিভলবার তাক করে দাঁড়িয়ে। গুণ্ডাটাও তার দেশী পিস্তল

উঁচিয়ে দাড়িয়ে। দু'জনেই সতর্ক। দু'জনেই সুযোগের অপেক্ষায় চিতাবাঘের মতো শিকারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

কি হবে এবার?

হঠাৎই বাইরে থেকে সদর দরজার ছেকল খুলে চারটে বন্দুকধারী কনস্টেবল বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

গুণ্ডাটা ঘুরে দাঁড়াতেই কেদার বাজপাখির মতো সাঁ করে ছুটে এলো লোকটার দিকে।

বড়জোর দশ সেকেন্ড। গুণ্ডাটা বুঝতেও পারলো না, কোথা দিয়ে কি ঘটে গেলো। উড়ন্ত চাকির মতো কেদারের বাঁ পা আছড়ে পড়লো তার পিঠে। একটা কনস্টেবলের কোলে গিয়ে পড়লো লোকটা। পিস্তল ছিটকে গেলো। কেদার চিৎকার করলেন, ওকে ধরুন! ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল!

চারজন কনস্টেবল মিলে লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে চেপে ধরে রাখলো।

বদ্রী আর হরেন ছুটে গিয়ে বন্দী জীবেন বিশ্বাস, তার বউ আর বাচ্চা মেয়ে শিল্পীকে মুক্ত করে দিলো। চটের প্যাকেটে মোড়া ফুলদানিটাও পাওয়া গেলো।

সেই রাতে চন্দননগর থানায় চারটে ক্রিমিনালকে জেরা করে ঠনঠনিয়ার কার্যকলাপ আর আস্তানার খবর জেনে নিলো পুলিস। সেটা জানিয়ে দেওয়া হলো কলকাতা পুলিসকে।

পরদিন ভোরে কলকাতা পুলিস নিমতলা কাঠপট্টির ভেতরে ঠনঠনিয়ার আস্তানায় হানা দিয়ে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর খোয়া যাওয়া ফুলদানিটা উদ্ধার করলো শেষ পর্যন্ত। ঠনঠনিয়াকেও অ্যারেস্ট করা হলো।

দিন সাতেক পরের কথা। উদিতভানু ইনফরমেশনে সকালবেলা কেদার আর বদ্রী খবরের কাগজ পড়ছিলো আর টকাটক্ করে ভেজানো ছোলা আর চিনেবাদাম মুখে পুরছিলো। এমন সময় ক্র্যাং-ক্র্যাং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। কেদার মজুমদার টেলিফোন ধরলেন।

হ্যালো!

হ্যালো, কেদারবাবু। আমি প্রহ্লাদ চক্রবর্তী বলছি।

আরে বলুন বলুন। কেমন আছেন?

ভালোই আছি। একটা খবর আছে।

কি খবর?'

আমি আর জীবেন বিশ্বাস বিশ্ববন্ধুবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি, ফুলদানি

দু'টো রাষ্ট্রীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় প্রেজেন্ট করে দেবো।

বাঃ! দারুণ ব্যাপার!

সেদিন আপনারাও থাকবেন।

নিশ্চয়ই। এমন একটা ভালো কাজে থাকবো না! অবশ্যই থাকবো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কেদার চিৎকার করে ডাকলেন—দিলানন্দ! ও দিলানন্দ!

দিলানন্দ সিং ছুটে এলো।—ক্যায়া মাংতা!

গোপালদার দোকান থেকে দু'টো লেমন টি আর বিস্কুট নিয়ে এসো।

কয়ঠো বিস্কুট মাংতা শুদ্ধ করিয়ে বোলেন।

দু'টো চা, দু'টো বিস্কুট শুদ্ধ করিয়ে নিয়ে এসো বাপু! হয়েছে?

হাঁ জী। শুদ্ধ বাত বোলনা চাহিয়ে।

